শনিবারের চিঠি

৭ পৌষ ১৩৯১ □ ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৪

নির্বাচনী সফর আমেথি

মানেকার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা

রাজীব
আমেথিতে কতটা
সুনিশ্চিত

ময়না তদন্ত কার্যত বন্ধ

লোকসভা নির্বাচন বিহার □ মাফিয়ারা একজোট

এ. কে. রায়ের বিবৃতি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত)।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত)।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত :
রবীন্দ্র-রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা–২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা–৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায়।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি।। বনফুল।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল : হাটেবাজারে ৮ টাকা।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা।। অধিক লাল ১০ টাকা।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা।। লাল মেঘ ১০ টাকা।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা।। যখন বসন্ত ১০ টাকা।। স্মৃতি সততই সুখের।। (আমেরিকা ও ইউরোপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা।। নীল আকাশ ৮ টাকা।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা-বসন্তের উত্তর ১০ টাকা।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট।। কলিকাতা-৭৩

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীবের নির্বাচনী কেন্দ্র আমেথি এখন উত্তাল। গান্ধী পরিবারের দুই সদস্য পরস্পরের মুখোমুখি। রাজীবের নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু উন্নয়ন। অন্যদিকে মানেকা সামনে নিয়ে আসছেন উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিকে। আমেথি শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছে একদিকে বিকাশ অন্যদিকে গান্ধী পরিবারের কলহ। আমাদের প্রতিবেদক জয় দাশগুপ্ত আমেথির বহু নির্বাচনী সভা এবং দূরবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়েছেন এই কেন্দ্রটির মনের ভাব বোঝার উদ্দেশ্যে।

নির্বাচনের মুখে সেই জনগোষ্ঠীই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ভোটার হিসাবে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে নির্বাচনী সমীক্ষা চালিয়ে আমাদের প্রতিবেদক অমিত মুখার্জীর মনে হয়েছে নির্বাচনী প্রচারেও এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা সব দিক থেকেই অবহেলিত।

পদাতিকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে বাঙালী পাঠক অবহিত। সুভাষবাবু মার্কসবাদী। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের পক্ষে। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি প্রচারও চালাচ্ছেন। সুভাষবাবু মনে করেন কমিউনিস্টদের সকলেরই উচিত ছিল কংগ্রেসকে সমর্থন করা। 'বামপন্থা'র নামাবলী এখন অকেজো হয়ে গেছে।

সূচীপত্র

দাঙ্গা বিধ্বস্ত শহর জেগে উঠেছে
নির্বাচনী উত্তেজনায় □ জয় দাশগুপ্ত
নির্বাচন জয়ের চাবিকাঠি
অনুন্নত সম্প্রদায়ের হাতে □ অমিত মুখার্জী
কলকাতার তিনটি আসন
কার কব্জায় □ সমীর মিত্র
শুধাই একমাত্র হাতিয়ার □
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজনীতিতে নতুন রক্ত আসুক/জয়া বচ্চন □
রঞ্জন সেন
যোদ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে কংগ্রেসের দিকে
পাল্লাভারী □ নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদায় বরকতের জয় নিয়ে তেমন
দ্বিধা নেই □ সিদ্ধার্থ গুহরায়
কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার/সমর মুখার্জী □
অনুপ সরকার
জয় নিয়ে অশোক সেনের কোন দ্বিতীয়
ভাবনা নেই □ অনুপ সরকার
ধানক্ষেতি রামনগরে পুলিশী তান্ডব □
নিজস্ব প্রতিনিধি
দেশের মানুষের জন্য কোন দল
কি করেছে ? □ পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য
আই এ্যাম এ বাহাত্তুরে □ ইন্দ্রজিৎ
লোকসভা নির্বাচন ব্যারাকপুর □ রবি দাস
জলপাইগুড়ি – কং (ই) ও
সি. পি. এম. □ অঞ্জন শিকদার
সংবাদ-বিসংবাদ □
শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী হাওয়াই ভোলা সেনকে
জেতাবে □ নিজস্ব প্রতিনিধি
'পদাতিকে'র সুভাষ সক্রিয়ভাবে সমর্থন
করছেন কংগ্রেসকে □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্ নির্বাচন সমীক্ষা
আসানসোল □ সুতীর্থ রায়
প্রচ্ছদ □ প্রদোষ কান্তি বর্মণ
ছবি □ কবীর আইচ, অলক কুমার মিত্র,
প্রবীর দাস, দিলীপ ঘোষ, দিলীপ শেঠ,
জয় দাশগুপ্ত পার্থসারথী সেনগুপ্ত,

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
৭ পৌষ, ১৩৯১ □ ২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস; সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ
প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক: রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩

দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন: ৬১৭৬৭১

ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি-সমৃদ্ধ দলের হাতে সে ন্যস্ত করতে পারে সকল দায়িত্ব। নিশ্চিত নিরাপত্তা ও বিঘ্ন হননকারী এক অগ্রগতি তথা উন্নয়নকে জানাতে পারে আন্তরিক সংবর্ধনা। আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয় চোখের সামনে নগ্ন সত্য হিসেবে নেতৃত্বের যে শূন্যতা সে প্রত্যক্ষ করছে, সেই সত্যটুকু তার কাছে অনস্বীকার্য মনে হল। কোন দলকেই সে উজাড় করে দিল না কোটি-মানুষের স্বাক্ষরের প্রতীক অজস্র ভোট-পত্র।

জনজীবনের প্রতিদিনের সংঘর্ষ ও ছন্দের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে ভবিষ্যতের চলার পথ ও তার নেতৃত্ব। বিশাল এই দেশ তার বিপুল বৈচিত্র্যে কোথাও সামান্যতম কৃপণ নয়। মার্কিনী উন্নয়ন বা বিদেশ থেকে রপ্তানীকরা বিপ্লবের মধ্যেই আমাদের নির্বাচন সীমাবদ্ধ নয় – এ সত্য যেন বিস্মৃত না হই।

সমস্যার পর সমস্যা যখন আপাতভাবে সমাধানের অতীত একটি পরিমন্ডল গড়ে তোলে, সাধারণভাবে সেই অবস্থাটিকে আমরা সংকট বলে চিহ্নিত করে থাকি। জাতীয় জীবনে এ ধরণের সংকট থেকেই ঘটে থকে পুনরুজ্জীবন। ধারাবাহিকতাকে অভ্যাস এবং বাধ্যতা বলে গণনা করলে ভুল করা হবে। বরং অতীতের দাসত্বকে চূর্ণ করতে সক্ষম যে ঐতিহ্য তার প্রতি আছে আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা।

উনিশশো চুরাশি সালের শেষ সংখ্যাটি বদলে যাবে আগামী সপ্তাহে। গ্রহব্যাপী বছর শেষের মিশ্র অনুভূতি ও উৎসবের এই সপ্তাহটি ভারতবাসীর কাছে এবার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামনের পাঁচ বছর শুধু নয়, হয়ত আগামী কয়েক দশকের জন্য ভারতবর্ষ তার যাত্রাপথ নির্ণয় করবে সদ্য শীতের আরামপ্রদ আবহাওয়ায়।

গত সংখ্যাকে আমরা চিহ্নিত করেছি প্রাক-নির্বাচন সংখ্যা হিসাবে। বর্তমান সংখ্যাটিকে বলা যেতে পারে নির্বাচন সংখ্যা। ভোটের বাক্সের অন্ধকার, অপরিসর স্থানের তেমন কিছু মাহাত্মও নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস সঞ্চিত রয়েছে নির্বাচক মন্ডলীর ঐ জনবহুল ভারতবর্ষের জন্য, যাঁরা এই মুহূর্তে বিবেচনার কাজে মগ্ন।

প্রচ্ছদ কাহিনী

জয় দাশগুপ্ত

রাজীব হয়তো জিতবেন, কিন্তু চমকে দিতে পারেন মেনকা

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী হাওয়ায় অভ্যস্থ যে কেউ উত্তরপ্রদেশে এলে প্রথমেই চোখে যেটা আশ্চর্য ঠেকবে, তা হল, নির্বাচনের মাত্র দুসপ্তাহ আগেও স্টেশনের দুপাশে কিংবা শহর ও গ্রামের পাকা ও মাটির বাড়ির দেওয়ালে নির্বাচনী প্রচারের এক আশ্চর্যজনক অত্যল্পতা। এলাহাবাদকে বাদ দিলে এবারের লোকসভা নির্বাচনের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র আমেথিও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আপাত-উদাসীনতার এই খোলস ভেঙে একটু ভিতর স্পর্শ করলেই টের পাওয়া যায় নির্বাচনী উত্তাপ। আর ক্রমশই বাড়তে থাকে তা।

আমেথি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র অথবা বহুপ্রচারিত রাজীব-মেনকার লড়াইয়ের জন্যেই নয়, গুরুত্ব পেয়েছে আরো একটি কারণে। এলাহাবাদে বহুগুণা ও বালিয়াতে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মেনকাও সেই ভাগ্যের অধিকারী যা তাকে সুযোগ দিয়েছে কংগ্রেস (ই)-র সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ের। একদিকে যেমন রাজীবের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উড়ে আসছেন কংগ্রেসী কর্মীরা অন্যদিকে তেমনই মেনকার সমর্থনে বি.জে.পি, লোকদল ও জনতা পার্টির কর্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন গ্রামে গ্রামে। গুরুত্ব আরো বেড়েছে সুলতানপুর কেন্দ্রে বি.জে.পি প্রার্থী রবীন্দ্র প্রতাপ সিং নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে মেনকার পাশে এসে দাঁড়ানোয়। 'আর কিছুদিনের মধ্যেই বাজপেয়ী, চরণ সিং, চন্দ্রশেখর, রামা রাও সকলেই এসে যাবেন মেনকার সমর্থনে বক্তৃতা করতে'–গৌরীগঞ্জের বাসিন্দা মহাদেও সিং-এর এই কথার সমর্থন কিছুদিন পরেই পেয়েছিলাম সংবাদপত্রে, যা এ ধারনাকে আরো শক্ত করে যে বিরোধিরা অন্তত এই একটি কেন্দ্রের দিকে নজর দিয়েছেন দলবদ্ধভাবে। কিন্তু কেন? স্বয়ং মেনকা গান্ধীর বক্তৃতা থেকেই ব্যাপারটা খানিক বোঝা যাবে। প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় মেনকা শোনাচ্ছেন সেই রাক্ষসের গল্প যার প্রাণভোমরাটিকে পুকুর থেকে তুলে এনে টিপে মেরেছিল এক রাজকুমার। রাজীব তথা কংগ্রেস (ই) সরকারের প্রাণভোমরা হিশেবে আমেথিকে হাজির করে মেনকা

আহ্বান জানাচ্ছেন এখানেই তাকে নিকেশ করে দিতে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চ-এর জিপ থেকে স্লোগান উঠছে 'অটল, মেনকা আউর চৌধুরী কি হ্যায় ললকার, বদলো বদলো ইয়ে সরকার' –যা শুনে ভ্রম হয় এই কি সেই উত্তরপ্রদেশ যেখানে বিরোধী ঐক্য অন্তর্কলহে সবচেয়ে বেশি ছিনভিন্ন! বুঝতে অসুবিধে হয় না যে প্রাণভোমরার রূপকটিকে গ্রহণ করেছেন বিরোধী নেতারাও।

অপর পক্ষ কংগ্রেস (ই)-র প্রচারে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তা হল আমেথির উন্নয়ন। 'আমেথি মানে বিকাশ, বিকাশ মানে রাজীব'–শুধুমাত্র আমেথিতে নয়, আমেথি থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত স্টেশনের ধারে মাঝে মধ্যে যে দেওয়াল লিখন চোখে পড়েছে সেখানেও এই একই স্লোগান। অর্থাৎ আমেথিকে উন্নয়নের এক প্রোটোটাইপ হিশেবে দেখাতে চাইছে কংগ্রেস (ই)– আর সেই উন্নয়নের পরিচালক রাজীবের নাম জুড়ে 'উন্নয়ন' ও 'রাজীব' শব্দদুটিকে খেলাতে চাইছেন তাঁরা। আর একটা অদ্ভূত ব্যাপার হল কোন জায়গাতেই প্রার্থীর কোন নাম নেই, আছে রাজীবের নামে জয়ধ্বনি 'আপকা ডাহিনা হাত রাজীব' কিংবা 'রাজীব তুম আগে বঢ়ো, হাম

তুমহারে সাথ হ্যায়' অথবা 'উন্নয়ন কি বাস্তে, রাজীব কি রাস্তে' প্রভৃতি। এমনকি রায়বেরিলি, যেখানে কংগ্রেস (ই)-র গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং রাজীব-সুহৃদ অরুণ নেহেরু লড়ছেন সেখানেও পোস্টার ও দেওয়াল লিখনে রাজীবের একচেটিয়া আধিপত্য। স্বয়ং ইন্দিরার আমলেও এতটা বাড়াবাড়ি দেখা যায় নি।

৭,৩৮,৪৯৪ জন ভোটার অধ্যুষিত আমেথি, জগদীশপুর, গৌরীগঞ্জ, তিলোই এবং সলোন–এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রসহ এপার থেকে ওপার প্রায় ষাট কিলোমিটার দীর্ঘ অঞ্চল নিয়ে আমেথি লোকসভা কেন্দ্র। '৮০-র নির্বাচনে সঞ্জয় গান্ধী জয়ী হয়েছিলেন এ কেন্দ্র থেকে। কিছুদিন পরই বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয়ের মৃত্যু রাজীবকে নিয়ে আসে সক্রিয় রাজনীতিতে। বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস (ই) পায় একচেটিয়া সাফল্য। ঐ পাঁচটি কেন্দ্রে জয়ী

সঞ্জয় সিং, রাম সেবক, রাজপতি দেবী, হাজি বসির এবং সিন বাল্যা সকলেই নির্বাচিত হন কংগ্রেস (ই) টিকিটে। এ সমস্ত তথ্য থেকে ভাবা যেতে পারে যে লোকসভা নির্বাচনে রাজীবের সাফল্য আসবে মসৃণভাবে। কিন্তু ১৯৮১-'৮৪-এর মধ্যে অনেক ওলোটপালট হয়ে গেছে। গান্ধী পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছেন মেনকা। আকবর আহমেদ (ডাম্পি)-এর সহায়তায় তৈরি করেছেন রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চ এবং জানিয়ে দিয়েছেন আমেথিই হবে তাঁর

নির্বাচন কেন্দ্র। গত বিধানসভার উপনির্বাচনে সঞ্জয় মঞ্চ পেয়েছে দুটি আসন। গত দুবছরে এই লোকসভা কেন্দ্রের অসংখ্য গ্রামে ঘুরে বেরিয়েছেন মেনকা। যোগাযোগ করেছেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। নিজেকে হাজির করেছেন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিতা একজন অসহায় বিধবা হিশেবে। সঙ্গে শিশু বরুণের উপস্থিতি সমর্থ হয়েছে গ্রামবাসীদের সহানুভূতি আদায়ের। পাশাপাশি আছে গ্রামের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। গত দুবছর ধরে মেনকা সে সমস্ত তীব্রতাকে সযত্নে উসকে দিয়েছেন। রামপুর গ্রামের কৃষক লাল্লু সিং–এর মতে 'এর আগে যেসব দল এসেছে তাদের দেখা পাওয়া যেত শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে। ওরা আসত ভোট চাইতে, কিন্তু মেনকার দেখা আমরা প্রায়ই পেতাম। সঞ্জয় মঞ্চ–এর কর্মীদের কাছে আমরা আমাদের অবস্থার কথা জানাই। পরে মেনকা এসে আলোচনা করেন সেইসব সমস্যা নিয়ে'। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ লোকেশ্বর প্রতাপ ঘাড় নাড়লেন 'ঠিকই বলছে। কিন্তু মেনকার ক্ষমতা কতটুকু? রাজীবের হাতেই তো সব'।

এই এক দোটানায় পড়েছেন গ্রামের মানুষ। বিশেষ উন্নতি না ঘটলেও তাঁরা এটা জানেন যে ক্ষমতা রাজীবের হাতে। আর সেকারণেই বোধহয় এবার নির্বাচনী প্রচারে রাজীবকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করলেও মেনকা জোর দিচ্ছেন কংগ্রেস (ই) সরকারের পতন ঘটিয়ে কেন্দ্রে এক বিকল্প সরকার স্থাপনের সম্ভাবনার উপর।

'আমেথি মানে বিকাশ........'

বহুব্যবহৃত এই স্লোগানের সঙ্গে বাস্তবকে মেলাতে চাইলে প্রথমেই যে সব ব্যাপার কোন নবাগতকে প্রভাবিত করবে তা হল আমেথি স্টেশন এবং আশপাশের অঞ্চল। ঝকঝকে স্টেশন বিল্ডিং, দামী হোটেল কক্ষের মত রিটায়ারিং রুম ছাড়িয়ে রাস্তায় নামলেই পায়ের তলায় পরিচ্ছন্ন পাকা রাস্তা। ইতস্তত ছড়ানো দোকানপাট। বোঝা যায় সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে শহর। এখানকার স্টেট গেস্ট হাউস লজ্জা দিতে পারে পশ্চিমবঙ্গের যে কোন শহরের সার্কিট হাউসকে। এখনও কোন হোটেল গড়ে ওঠে নি। স্টেশনের রিটায়ারিং রুমের অল্পবয়সী অ্যাটেনড্যান্ট এরশাদ খান আমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গেই জানালেন 'আর কিছুদিনের মধ্যে আমেথিকে চেনাই যাবে না। রাজীব এটাকে বম্বে বানাতে চাইছেন।' কিন্তু ইতিমধ্যেই যেটুকু কাজ হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া কি? অবসরপ্রাপ্ত রেডিও কো–অপারেটর আটষট্টি বছরের ডি.এন.শুক্লর–মতে 'রাজীব নির্বাচিত হওয়ার পর অনেক উন্নতি হয়েছে। হাসপাতাল হয়েছে, পাকা রাস্তা হয়েছে, কারখানা বসেছে....' ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যতই গ্রামের দিকে এগোনো যায় ততই মিলিয়ে যেতে থাকে শুক্লজির কথা। আর এই উন্নয়নের ধারণার জ্যান্ত প্রতিবাদ হিশেবেই যেন পাকা রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে জারোটা গ্রামের পাউডারের মত মিহি ধুলোয় মাখা রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়েছিল সীতারাম। আমাদের গাড়ি যখন থামল তখন বোঝা অসম্ভব ছিল লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে। ধূলিধূসরিত খালি গা, পরনে নেংটি সীতারাম শুয়ে ছিল আকাশের দিকে চোখ তুলে। দ্রুত ওঠানামা করছিল বুক। নিঃশ্বাসের তালে তালে এক হয়ে যাচ্ছিল পেট আর পিঠ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা তুলে বসাই সীতারামকে। জল আর বিস্কুট খেয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে বিড়বিড় করে আপনমনে বকতে বকতে দূরে মিলিয়ে গেল সীতারাম। দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের চেহারা জানান দিচ্ছিল প্রকৃত অবস্থাটা সত্যই কি। ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন মেনকা গান্ধীকে ওদের অভিযোগ জানাতে।

'৮১ তে রাজীবের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এলাকাকে শিল্পসমৃদ্ধ নগরী হিশেবে গড়ে তোলার। ''ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (BHEL)' ও 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক লিমিটেড (HAL)' এর মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা দ্রুত স্যাংশনড হয়ে ছিল। জগদীশপুরে প্রথমটির উদ্বোধন করেছেন রাজীব স্বয়ং। কিন্তু হৈ-হল্লার পিছনে

একটা প্রশ্ন উঠে আসে অতি সংগতভাবে, তা হলো, আমেথির সাধারণ মানুষের এতে কোন্ উপকার হবে? ঐ দুটি কারখানায় প্রয়োজন শুধুমাত্র দক্ষ কর্মীর, যার জোগান দিতে অনগ্রসর আমেথি অক্ষম। এ কাজে প্রয়োজনীয় লোক তৈরির জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত ওয়ার্কশপটি চোখে পড়ল জারোটা গ্রামে ঢোকার বেশ খানিকটা আগে পাকা রাস্তার ধারে। বেশ কিছুদিন হল নির্মিত এই ওয়ার্কশপটির গেট কখনও খুলতে দেখা যায় না। তিলোতে একটি বিদেশী কম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া আছে সার কারখানা খোলার। গৌরীগঞ্জে তৈরী হওয়ার কথা এশিয়ার বৃহত্তম সাইকেল কারখানা। আমেথির উন্নয়নের নামে ইতিমধ্যেই খরচ হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বিশাল টাকার ধাক্কা অনুভূত হয় নি গ্রামে। ছাব্বিশ বছরের তরুণ ছাত্র মহেশ্বর প্রসাদ জানালেন 'একের পর এক কারখানা নিয়ে মাতামাতি চলছে। কেউ একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না গ্রামাঞ্চলের দিকে। এসমস্ত দিয়ে আদৌ কোন উপকার হবে না।' মাঝবয়সী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শেখ আব্দুলা অবশ্য এতটা সিনি-ক নন, তাঁর মতে 'কারখানা অবশ্যই প্রয়োজন। গ্রামের প্রচুর ভালো ভালো ছেলে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আপনাদের কলকাতায় অনেক ছেলে চলে গেছে এখান থেকে। ওদের ধরে রাখতে হলে কারখানা অবশ্যই দরকার। কিন্তু গ্রামের জমির যদি কোন উন্নতি না হয় তাহলে একজনও মা-বাবা তাদের ছেলেকে কারখানায় পাঠাতে চাইবে না। জমি তাহলে দেখবে কে?' ওই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনেছি অধিকাংশের কাছে।

কারখানা বসানো ছাড়া আমেথির উন্নয়নের তালিকায় আর যা যা আছে তা হল পাকা রাস্তা ও হাসপাতাল। কিন্তু একটু খোঁজখবর নিলেই জানা যাবে যে যে রাস্তা নিয়ে এই প্রচার তা জনতা আমলেই স্যাংশনড় হয়ে ছিল। কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় ফিরে তা বাস্তবায়িত করেছে মাত্র। আর হাসপাতাল? রামগড় গ্রামের দীনদয়াল কিংবা তারাপুরের নাথুরাম অথবা ধৌরহরার হরদেও সিং-এর মতো প্রায় প্রত্যেকই অভিযোগ জানিয়েছেন হাসপাতালের অভাব সম্পর্কে। সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আছে কয়েকটি মোবাইল ডিস্পেন্সারি। লাকসারি বাসের মত দেখতে তাদের দুটিকে এক সকালে খানিকক্ষণ দেখেছিলাম স্টেশনের অদূরে সারা দেহে রাজীব গান্ধীর পোস্টার সেঁটে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। গ্রামে এদের দেখা পাওয়াটা বিরল ঘটনা।

এই অবস্থা নিয়ে পড়ে আছে আমেথির প্রায়, বারশ' গ্রাম। কৃষির অবস্থাও সংগীন। মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়ানো অনুর্বর জমি। কোথাও বা এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিতে বুনো ঘাসের জঙ্গল। সেচ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। এই রুক্ষ পরিবেশে মাঝে মধ্যেই চোখে পড়বে উটের সারি। কখনও বা ধুতি, গলাবন্ধ কোট আর বুট-পরিহিত ঠাকুর সম্প্রদায়ের কোন জমি মালিককে দেখা যাবে উদ্ধত ভঙ্গীতে হেঁটে যেতে, কাঁধে ঝোলানো দোনলা বন্দুক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুল মাস্টার জানালেন 'সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে সোনা ফলানো যেত এই জমিতে, কিছু কিছু জমিতে ট্রাকটর নেমেছে, উন্নত সার এসেছে কিন্তু জল-সমস্যার কোন সমাধান হয় নি'। প্রশ্ন করি 'জমি মালিকদের সঙ্গে চাষীদের সম্পর্ক কেমন?' বন্দুক কাঁধে দূরে মিলিয়ে যাওয়া লোকটির দিকে তাকিয়ে তিনি রহস্যজনকভাবে বললেন 'ইয়ে ইউ.পি হ্যায় সাহাব, কলকাত্তা নেহি। নিজেই বুঝে নিন না।'

গ্রামের এই অবরুদ্ধ যন্ত্রণাকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন মেনকা। কারখানা বসানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একের পর এক জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন গ্রামবাসীরা। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আর কারখানায় স্থানীয় লোকেদের চাকরির দাবীতে এবছরই গ্রামবাসীদের নিয়ে BHEL-এর গেটে মিছিল করে গেছেন মেনকা। ব্যক্তিগত অসহায়তার পাশাপাশি এইসব কাজের মাধ্যমে মেনকা মোটামুটি একটা ইমেজ তুলে ধরতে পেরেছেন। শুধু উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে অথবা কারখানা বসিয়ে গ্রামের কতখানি সমর্থন রাজীব পাবেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এর প্রমান পাওয়া যাবে এবছর আমেথি বিধানসভা কেন্দ্রের চারটি ব্লকের প্রধান নির্বাচনে, স্বয়ং রাজীব এসে চালিয়েছিলেন প্রচার। কিন্তু তা সত্ত্বেও চারটির মধ্যে দুটি কংগ্রেস (ই) জিতলেও বাকি দুটি ভাগ করে নিয়েছে জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চ। যে দুটিতে কংগ্রেস (ই) জিতেছে, শোনা যায় তার একটিতে জয়ী সঞ্জয় মঞ্চ প্রার্থী পরে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেস (ই) তে।

তবে অবস্থা খানিকটা যে পাল্টাচ্ছে তা স্বীকার করলেন রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চের যুব-বাহিনী 'সঞ্জয় সেনা'র সভাপতি মহেশ শুক্ল, 'মেনকার প্রতি গ্রামের যে সমর্থন ছিল তা কিছুটা কমে গেছে ইন্দিরার মৃত্যুতে। তার উপর রাজীব প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় যে ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেছে তাও প্রভাবিত করবে

খানিক টা'।

রামগড়, তারাপুর, কালিকিন, ধৌরহরা প্রভৃতি গ্রামে মেনকা গান্ধীর সভায় জনতা নেহাত কম না হলেও বেশ ক'জন জানালেন 'আগের চাইতে লোক খানিকটা কমেছে।'

অন্যদিকে স্টেশনের সামনে পাঁচিলে ঘেরা চত্বরের ভিতর বিশাল যে সাদা বাড়িটিতে কংগ্রেস (ই)-র কার্যালয় তা সকাল থেকেই ব্যস্ত। চত্বরে বেশ কিছু জিপ মাইক ও ফ্ল্যাগসহ রেডি, প্রচারে বেরনোর অপেক্ষায়। অফিসে গিয়ে পেলাম জেলা যুব কংগ্রেস (ই)-র সাধারণ সম্পাদক হরিশঙ্কর পাঠককে। পাঠকজী তখন অতি ব্যস্ত, কোন জিপ কোনদিকে যাবে সেই নির্দেশ দিতে। পরিচয় দিতে আমাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে পাঠকজী গেলেন বাইরে। বাইরে তখন জিপগুলিকে ঘিরে জটলা। প্রত্যেকের চোখেমুখে এক টিপিক্যাল ঔদ্ধত্যের ছাপ যা বোধহয় যে কোন জায়গাতেই শাসকদলের একচেটিয়া। আমেথি বিধানসভা কেন্দ্রের এম.এল.এ উত্তরপ্রদেশের বনমন্ত্রী, এবং আমেথির ভূতপূর্ব রাজা রণঞ্জয় সিং-এর পুত্র সঞ্জয় সিং-এর খোঁজ করি এক যুবকের কাছে। 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'-যুবকটির উদাসীন প্রশ্ন। কলকাতা শুনে এবার তাঁর গলায় ঝাঁঝ আসে 'কোন পার্টি পাঠিয়েছে আপনাকে? সি.পি.এম?' বহুকষ্টে হাসি চেপে তাঁর ভুল ভাঙ্গাই। এবার একটু সদয় হন যুবকটি 'আজ তো সঞ্জয়জীকে পাবেন না। উনি বাইরে গেছেন। আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যান। তবে পাবেন কি না বলতে পারছি না।' ইতিমধ্যে হরিশঙ্কর পাঠক ফিরে এসে আমাকে নিয়ে ঘরে বসান। অত্যন্ত মার্জিত ব্যবহার। পরিচয়পত্র দেখে প্রশ্ন করেন, 'বলুন কি জানতে চান?'

মিনিট পনেরো কথাবার্তার মধ্যে পাঠকজী এলাকার মোটামুটি একটা পরিচয় দিয়ে দেন। রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চকে এককথায় উড়িয়ে না দিয়ে জানালেন 'ওরা প্রচার করছে কোন উন্নতি হয় নি কিন্তু মানুষ সে কথায় ভুলবে না। বিরোধীরা ওদের সমর্থন করলেও রাজীবজী সহজেই জিতবেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা রাজীবজীর প্রতি সহানুভূতি বাড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়। আমেথির উন্নয়নই জেতাবে রাজীবজীকে।'

এ মাসের বারো তারিখে রাজীব গান্ধী আসছেন আমেথি। এর মধ্যে কংগ্রেস (ই)-র প্রধান কাজ জিপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করা। প্রশ্ন করি পাঠকজীকে, 'জিপে করে প্রচারের এই পদ্ধতি কতটা ফলদায়ক? বিশেষত চলন্ত জিপের অধিকাংশ বক্তৃতা অথবা স্লোগানই তো ভালোভাবে কানে ঢোকে না'। 'কিন্তু এছাড়া উপায় নেই, উত্তরপ্রদেশে একেকটা লোকসভা কেন্দ্র বিশাল বড়। আছে শত শত গ্রাম। অল্প সময়ের মধ্যে এ ছাড়া কোন উপায় নেই। আর তাছাড়া এখানকার মানুষ এ পদ্ধতির সঙ্গে বহুদিন ধরে পরিচিত।'

গত বিধানসভা নির্বাচনে সঞ্জয় সিং জিতেছেন সাঁইত্রিশ হাজার ভোটে। পাঠকজীর আশা লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস (ই)-র পক্ষে আরো বেশি ভোট যাবে।

এবার রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চ এর কার্যালয়। একটা বিরাট নিমগাছের ধারে একতলা স্কুল বাড়ির মত অন্ধকার এক বাড়ি। বাইরে সাদা-সবুজ বোর্ডে মঞ্চ-এর নাম। গাছের ছায়ায় জনাচারেক কর্মীর সঙ্গে বসে ছিলেন মহেশ শুক্ল। শুনলাম সেদিনই ছ'টি গ্রামে মেনকার বক্তৃতা করার কথা। কথাবার্তা শুরু হতে না হতেই সঞ্জয় মঞ্চ-এর নিশান লাগানো জিপ এসে হাজির। ইস্ত্রিহীন কোট প্যান্ট পরিহিত যে লোকটি জিপ থেকে নামলেন তাঁকে দেখেই মনে পড়ে গেল পত্র-পত্রিকায় বহুবার দেখা একটি ছবির ...থা-আকবর আহমেদ (ডাম্পি)। উঠে এগিয়ে যাই। কিন্তু না ডাম্পি নয়, ইনি আসগর আহমেদ, ডাম্পির যমজ ভাই। আলাপ হতেই পান এগিয়ে দিয়ে জানালেন 'আপনি তো রাস্তাঘাট চেনেন না। বাসও পাবেন না। তার চেয়ে গাড়িতে উঠে পড়ুন। এই গাড়িটা মেনকাজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।' আসগর সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ি জিপে। শুরু হয় সফর।

জিপে মহেশ শুক্লকে প্রশ্ন করে জানতে পারি যে এবারের নির্বাচনে সঞ্জয় মঞ্চ-এর প্রধান কাজ হল যতটা সম্ভব গ্রামে গিয়ে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এই একটা ব্যাপারে রাজীব পিছিয়ে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর শিরোপা তাকে বাধা দিয়েছে নির্বাচনে আমেথির উপর বিশেষ নজর দিতে। ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে আবার দেখা যাবে এখানে। এর মধ্যে যেটুকু সময় এখানে এসেছেন, তাঁকে ঘিরে থেকেছে কম্যান্ডোরা যা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি রাজীবের।

সঞ্জয় মঞ্চ সে ব্যাপারে অনেকটা সফল। কিন্তু গত এক বছর ধরে একনাগারে বাজানো গান্ধী পরিবারের কেচ্ছার ভাঙ্গা রেকর্ড যে নির্বাচনে অচল সে কথা বুঝে যেসব দাবি সঞ্জয় মঞ্চ তুলে ধরেছে, তা হল, বেকারি দুর করতে হবে, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে গ্রামে, দূর করতে হবে ভ্রষ্টাচার, চোদ্দ বছর পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা অবৈতনিক করতে হবে, জোর দিতে হবে

'রাজীবের সময় কোথায় আমেথিতে নজর দেওয়ার?' হরদেও সিং (মাঝারি কৃষক)

কুটির শিল্প তথা লোকউদ্যোগের উপর আর কমিয়ে আনতে হবে আর্থিক বৈষম্য।

কিন্তু একমাত্র ভ্রষ্টাচার ছাড়া বাকি অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে কোন মিটিং—এই মেনকাকে বেশি কথা বলতে শুনি নি। হয়তো তাঁর নিজের কাছেও পরিষ্কার নয় তা। পরিষ্কার নয় সেই বিরোধিদের কাছেও যাঁরা মেনকার সমর্থনে ছুটে এসেছেন। বি.জে.পি'র এস.পাণ্ডে আইনের ছাত্র। এই যুবকটি বার বার আমাকে যে কথা বুঝিয়ে গেলেন তা হল মেনকা গান্ধী জিতবেনই তার কারণ বিরোধিদের সমর্থন। লোকদলের এক বক্তা আগুনঝরানো বক্তৃতায় রাজীবকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু তা সবই হল ওপর ওপর।

মেনকার সঙ্গে প্রধান বিরোধী নেতা এবং বক্তা হিসেবে যে লোকটি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি হলেন রবীন্দ্রপ্রতাপ সিং (বি.জে.পি)। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে, এই রবীন্দ্রপ্রতাপই '৭৭-এ সঞ্জয় গান্ধীকে পরাজিত করে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। রাজনীতির খেলায় সেই রবীন্দ্রপ্রতাপ এখন মেনকার এক বড় সহায়।

প্রতিটা মিটিং-এই এক চিত্র। হয় রবীন্দ্রপ্রতাপ অথবা অন্য কেউ প্রথমে বক্তৃতা দিচ্ছেন। হলুদ শাড়ির ঘোমটায় মাথা ঢেকে মেনকা দাঁড়িয়ে থাকছেন পাশে। তারপর একহাতে ঘোমটা ধরে অন্য হাতে লাউড স্পিকার ধরে ধীর এবং কিছুটা ভাঙা গলায় শুরু করছেন নিজস্ব বক্তব্য। রবীন্দ্রপ্রতাপ দিচ্ছেন মেনকার বিরুদ্ধে কুৎসার জবাব, গালাগাল করছেন রাজীবকে, মেনকা তুলে ধরছেন নিজস্ব অসহায়তা, গ্রামের দুর্দশা, কংগ্রেস(ই)-র অপকাণ্ড আর এই রাজত্বকে শেষ করে দেবার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করে দ্রুত চলে যাচ্ছেন জিপের ভিতর, পরের গ্রামের উদ্দেশ্যে। এই একই প্যাটার্ণ।

ইন্দিরা হত্যার পর কংগ্রেস (ই) শিখ বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে মেনকার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে 'বেটি হ্যায় সর্দার কি, দেশ কি গদ্দার কি'। স্বয়ং চরণ সিং দিল্লী থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই স্লোগানের, কিন্তু আশ্চর্য লাগল যে রবীন্দ্রপ্রতাপ বা মেনকা কেউই এই আওয়াজের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক নোংরামীকে আক্রমণ না করে শুরু করলেন নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে। অর্থাৎ মেয়েদের কোন জাত থাকে না, স্বামীর নামেই তার পরিচয়, সে অর্থে সঞ্জয়ের স্ত্রী হিশেবে মেনকা অবশ্যই হিন্দু ইত্যাদি, ইত্যাদি। মৃত্যুর আগে উড়িষ্যায় শেষ বক্তৃতায় ইন্দিরা জানিয়েছিলেন যে তাঁর প্রতিটা রক্তবিন্দু দেশকে সজীব করে তুলবে। ঐ কথাটিকে বেশ সুন্দর ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রপ্রতাপ 'যদি ঐ রক্তের একটা ফোঁটা হয় রাজীব, তবে আর এক ফোটা অবশ্যই গান্ধী পরিবারের বৌ মেনকা'। প্রচুর হাততালির মধ্যে আপ্যায়িত হচ্ছে এই ঘোষণা। সর্দারের বেটি বলে প্রচারিত কুৎসার জবাব দিতে রবীন্দ্রপ্রতাপ পাল্টা প্রশ্ন করছেন 'রাজীবের স্ত্রী সোনিয়াও তো হিন্দু নয়, রোম্যান ক্যাথলিক, তাহলে সেক্ষেত্রে কোন কথা উঠছে না কেন?'

'বিরোধী দলগুলির সমর্থন মেনকাকে শক্তিশালী করে তুলেছে'
এস. পান্ডে (বি.জে.পি)

'ওসব ইন্দিরা হাওয়া-টাকায় বাজে কথা, দুদিনে হাওয়া পাল্টে দেব।'
ত্রিভুবন নাথ সিং (প্রান্তিক চাষী)

মেনকা যতই বলুন না কেন যে এ লড়াই রাজীব-মেনকার লড়াই নয়, এ লড়াই সত্য বনাম ভ্রষ্টাচারের লড়াই এবং এ লড়াই এর চরিত্র রাজনৈতিক—একথা পরিষ্কার যে মেনকাকে বড় বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপারের উপরেই।

'ইন্দিরাজীকে ইয়াদ মে, রাজীব কে সাথ মে, মোহর লগেগি হাথ মে'—কংগ্রেস (ই)-এর এই স্লোগানের মোকাবিলা করতে মেনকাকে আরো বেশী করে আকড়ে ধরতে হয়েছে গান্ধী পরিবারের নাম। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এই নির্বাচনে আসলে লড়াইটা একটা ব্যাপার প্রমান করার লড়াই, তা হল—নেহেরু বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কে—রাজীব না মেনকা? দুপক্ষই কোমর বেধে লেগেছে এ ব্যাপারটিকে প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলতে। মেনকার সঙ্গে এবার পুত্র বরুণ ছিল না। কিন্তু মা ও ছেলের এই অসহায়তা এবং শ্বশুড়বাড়ি থেকে মেনকার বিতাড়নের কারণ হিশেবে রাজীবকে 'দুঃশাসন' বলে খাড়া করতে চাইছে সঞ্জয় মঞ্চ-সহ বিরোধীরা। এবং এই দুঃশাসন-রাজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে মেনকার সমর্থনে দাঁড়াতে আবেদন জানাচ্ছেন। 'মেনকা নাম নেহি, আন্দোলন হ্যায়' এই আকাশচুম্বী স্লোগান মেনকাকে আমেথির জয়প্রকাশে পরিণত করতে পারবে কি না দেখা যাক। 'ওরা স্লোগান দিচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ আর আমি বলছি জয় জওয়ান, জয় কিষান' মেনকার এই ঘোষণাই বা কতটা সমর্থন আদায়ে সক্ষম তার উপর নির্ভর করবে মেনকার রাজনৈতিক ভবিষ্যত।

প্রচারের দিক থেকে দেখলে কংগ্রেস (ই) যতখানি প্রফেশনাল, ঠিক ততটাই অ্যামেচার সঞ্জয় মঞ্চ। সংগঠিত ক্যাডার

বাহিনী সঞ্জয় মঞ্চ-এর নেই। কলেজ ছাত্র নান্নে খান জানালেন 'কলেজগুলোতে সঞ্জয় মঞ্চ-এর কোন সংগঠন নেই।' গ্রামেও সে অর্থে নেই কোন সুগঠিত ইউনিট। কিন্তু বেশখানিকটা পরিমান সমর্থন আছে। কালিকিন-এর কৃষক ত্রিভুবন নাথ সিং-এর মতে 'এখনও হাওয়া সেভাবে ওঠে নি। কিন্তু আর ক'একদিন যাক, দুদিনে হাওয়া ঘুরিয়ে দেব মেনকাজীর দিকে।' কীভাবে? 'এই যে দেখলেন আজ মেনকাজী প্রচার শুরু করলেন, এটা এখন চলবে ভোট পর্যন্ত। আর যতদিন যাবে ততই হাওয়া উঠবে। এখন তো সবে শুরু।'

ওখান থেকে ফেরার পথে দেখা লালবাহাদুর সিং-এর সঙ্গে। জানালেন, 'সংগ্রামপুর ব্লক-এর একটা বিরাট অংশ মেনকার দিকে যাবে। কংগ্রেস (ই)-র উপর মানুষ ক্ষুব্ধ প্রধানত দূর্নীতির জন্য। এই দেখুন না, আমি চেয়েছিলাম ব্লু অ্যামোনিয়া প্রিন্ট-এর লাইসেন্স। তা প্রথমেই সরকারি অফিসার চাইল টাকা, যে টাকা চাইল সেটা দিলে আর ব্যবসা করব কীভাবে?'

কিন্তু গ্রামের দুরাবস্থা ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েও মেনকা কতটা এগোবেন সে ব্যাপারে সন্দেহ অনেকেরই। ধৌরহরায় দেখা আনন্দপাল (মুন্নে) সিং-এর সঙ্গে। ভদ্রলোক পোস্ট অফিসে ইন্সুরেন্স এর দালাল, জমি জমাও আছে বেশ কিছু। সাইকেল নিয়ে গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'মানছি, গ্রামের বেশ খানিকটা সমর্থন সঞ্জয় মঞ্চ-এর দিকে আছে। কিন্তু কয়েক'শ বুথে নজরদারি করার মত লোক কোথায় ওদের? অথচ যে যতই প্রচার চালাক না কেন আসল যা ঘটার ঘটবে ঐ বুথগুলোতে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন এছাড়া ভাবা যায় না।' বুথ দখলের ভয় পাচ্ছেন সঞ্জয় মঞ্চ কর্মীরাও। স্বয়ং মেনকা প্রতিটা মিটিং এ এর বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে বলছেন প্রত্যেককে। মহেশ শুক্ল জানালেন 'এবার আমরা যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এদিকে নজর রাখতে। যদি বুথ দখলের কোন ঘটনা ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে নির্বাচন ক্যানসেল হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয়বার নির্বাচন হলে কেউ আটকাতে পারবে না মেনকাজীকে।'

বুথ দখল ছাড়াও আর একটি ব্যাপার সম্পর্কে এখানকার অনেকেই চিন্তিত-তা হল, নির্বাচনে শক্তিপ্রয়োগের ঘটনা। কংগ্রেস (ই) ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে হুঁশিয়ারী দিয়ে চলেছে যে নির্বাচনের ফল অন্যরকম ঘটলে ফলাফল ভালো হবে না। এ অভিযোগ শুধু সঞ্জয় মঞ্চ-এর নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষেরও। অন্তত তিনটি গ্রাম, দুটি স্টেশন এবং ট্রেনের মধ্যে অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে আভাষ পেয়েছি এ আতঙ্কের। দেওয়াল লিখনের জন্য লক্ষ্মৌ থেকে দৈনিক চল্লিশটাকা মজুরিতে আর্টিস্ট এনেছে কংগ্রেস (ই), আর সেই সঙ্গে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে পেশাদার মাস্‌লম্যান-এ অভিযোগের সত্যতা বোধহয় খানিকটা অনুভব করা যাবে কংগ্রেস (ই)-র জিপের দিকে তাকালে। কিছু কিছু চেহারা যেকোন লোককে চমকে দিতে পারে। অবশ্য এর সঙ্গে খানিকটা হলেও পাল্লা দিতে সক্ষম রবীন্দ্রপ্রতাপ সিং। রাজাভাইয়া নামে পরিচিত সিংজীর অনুচর-এর সংখ্যাও কম নয়। তবে শাষকদলের সমর্থকবাহিনীর সঙ্গে রাজাভাইয়া আদৌ এঁটে উঠতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে।

শুধু উন্নয়ন, বিকাশ অথবা সঠিক রাজনৈতিক প্রচারে আবদ্ধ থাকে না উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। জাতপাত-এর লড়াইয়ের প্রধান কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে তাকাতে হবে সেই দ্বন্দ্বের দিকেও। ঠাকুর, ব্রাহ্মণ, অনুন্নত শ্রেণী, তফশিলী জাতি, হরিজন ও মুসলমানরা মিলে আছেন আমেথির শরীরে। মোটামুটিভাবে তা ভাগ করা যায় এইভাবে- দশ শতাংশ ঠাকুর, পনেরো শতাংশ ব্রাহ্মণ, অনুন্নত শ্রেণী (আহির, যাদব, কুর্মী সহ) পঁচিশ শতাংশ, তফশিলি কুড়ি শতাংশ, হরিজন কুড়ি শতাংশ এবং মুসলমান দশ শতাংশ। কুড়ি শতাংশ জমি এখানকার ঠাকুরদের হাতে। ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত রবীন্দ্রপ্রতাপ এই সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশকে নিয়ে এসেছেন মেনকার সমর্থনে। ব্রাহ্মণ, অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে কংগ্রেস এবং বি.জে.পি-লোকদল-জনতার সমর্থকরা ভাগ হয়ে গেছেন। ফলে বি.জে.পি সহ বাকি বিরোধীদের সমর্থক ব্রাহ্মণ ভোট-এর অংশটিও হয়ত মেনকার দিকেই যাবে। কিন্তু কংগ্রেসের তুরুপের তাস হরিজন সম্প্রদায়, তফসিলীদের সম্পর্কে খুব জোর দিয়ে কিছু না বলা গেলেও কংগ্রেস হরিজনদের সম্পর্কে আশাবাদী। কংগ্রেসী কর্মীরা স্বীকার করেছেন তা, অস্বীকার করেন নি সঞ্জয় মঞ্চ কর্মীরাও। অন্যদিকে মুসলমানরা ভুগছেন দোলাচলে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে যে দল খেলাতে পারবেন, বেশি মুসলমান ভোট যাবে তাদের দিকেই। এক্ষেত্রে বি.জে.পি সমর্থনপুষ্ট মেনকা অসুবিধায় পড়তে পারেন।

কংগ্রেস (ই)-র হাত চিহ্নের বিরুদ্ধে সঞ্জয় মঞ্চ-এর প্রতীক সাইকেল। প্রতিটা মিটিং-এ মেনকা সাইকেলের উপকারীতা বুঝিয়েছেন। এ অঞ্চলের যাতায়াতের প্রধান যান সাইকেল সম্পর্কে মেনকা বলেছেন 'এই সাইকেল করেই বাজারে যান আপনারা, কোন দরকারে সাইকেলই আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু। বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে হলেও এই সাইকেলই পাশে এসে দাঁড়ায় আপনার। আর ঐ হাত ভোট চাইছে আপনার গলা টিপে ধরার জন্য। আপনার উপকারী সাইকেলের পাশে এসে দাঁড়ান।'

রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চকে কতখানি উপকারী ভাবছেন গ্রামবাসীরা? ধৌরহরার কৃষক হরদেও সিং বললেন 'খোলাখুলিই বলছি, আমি মেনকাজীর সঙ্গে আছি। রাজীব এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী, ওঁকে ভাবতে হবে গোটা দেশের কথা। আমেথির কথা ভাবার সময় কোথায় রাজীবের? একটা হাসপাতাল নেই এখানে, দরকার পড়লে যেতে হয় প্রতাপগড়। মেনকাজী নির্বাচিত হলে এসব সমস্যার দিকে নজর দিতে পারবেন।'

'৮১ র নির্বাচনে ৩,১৪,০৩১ টি ভোটের মধ্যে ২,৫৮,৮৮৪ টি ভোট গিয়েছিল রাজীবের পক্ষে। দুই বিরাধী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ইন্দিরার মৃত্যুজনিত সহানুভূতি ও প্রধানমন্ত্রীর

মর্যাদাসহ রাজীব এখন আরও শক্তিশালী। কিন্তু হরদেও সিং-এর মত একজন সাধারণ কৃষকের মনের কথাটি যদি গ্রামের মর্মবাণী হয় তাহলে লড়াই জমবে। ভোটের আগে রাজীবের সফর-এর উপর নির্ভর করছে অনেককিছু। রাজীব হয়ত জিতবেন, কিন্তু কিছু কিছু হিশেব মিলে গেলে চমকে দিতে পারেন মেনকা। □

মেনকা গান্ধী একটি অসম্পূর্ণ সাক্ষাতকার

(মেনকা গান্ধীর ঝটিকা সফরে একটি গোছানো সাক্ষাতকারের পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। ফলে মিটিং শুরুর আগে ও পরে, পথের মধ্যে অথবা গাড়ি থেকে নেমে স্টেজে যাওয়া ও গাড়িতে ফেরার সময়ে সারাদিন ধরে টুকরো টুকরো কথাবার্তার মধ্য থেকেই নির্দিষ্ট অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হল সাক্ষাতকারের ভঙ্গীতে। আশা করা যায় অমসৃণ পথে গৃহীত এই সাক্ষাতকারটি পাঠকের পড়ার মসৃণতায় কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না)

এত জায়গা থাকতে আপনি এরকম একটা শক্ত কেন্দ্র বেছে নিলেন কেন?

□ আমি বেছে নিলাম। এটা আমার স্বামীর কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে দাঁড়ানোটা আমার হক্। বরং বলুন রাজীব কেন বেছে নিল এ কেন্দ্র। একজন অসহায় বিধবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ওর লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

□ এ লড়াই কি একান্তই ব্যক্তিগত?

□ -না, কখনও নয়। এ লড়াই সত্যের সঙ্গে ভ্রষ্টাচারের লড়াই।

□ ভ্রষ্টাচার.....?

□ -হ্যাঁ, ভ্রষ্টাচার। তা ছাড়া আর কী? ওরা বলছে প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এতটা রাস্তা তো এলেন, উন্নতির কোন চিহ্ন দেখেছেন এখানে?

□ কিন্তু বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি তো তৈরি হয়েছে।

□ -ওগুলো কোন্ কাজে লাগবে? এখানকার ক'জন লোক চাকরি পাবে? বেকার সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। উন্নতির নামে টাকা ওড়ানো হচ্ছে অথচ গ্রামের দিকে কোন নজর নেই। কতগুলো ফালতু প্রজেক্ট-এ টাকা না উড়িয়ে উচিত ছিল এদিকে নজর দেওয়া।

□ আপনি নির্বাচিত হলে কি করবেন?

□ -অনেক কাজ আছে। বেকারি দূর করতে হবে। উন্নতি ঘটাতে হবে গ্রামের। তা না হলে দেশের উন্নতি কোনদিন সম্ভব নয়। যতদূর সম্ভব মানুষকে কাজ দিতে হবে। ওরা বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে গ্রাম শোষণ করছে। এসব বন্ধ করতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

□ আপনার কি মনে হচ্ছে, জিতবেন?

□ -নিশ্চই, আমি তো এ গ্রামেরই বৌ। প্রত্যেকে আমাকে চেনে। আমি প্রত্যেকের কাছে নিজে গিয়ে বলছি। ওরাও জানে আমি জিতলে গ্রামের উপকার। গ্রামের লোক আমার সঙ্গে আছে। ওরা জানে সঞ্জয়ের আদর্শকে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এটা একজন হিন্দু মেয়ের কর্তব্য।

□ কিন্তু কংগ্রেস (ই) তো আপনাকে সর্দারের মেয়ে বলে প্রচার করছে।

□ -(উত্তেজিত ভাবে) ওরা কুৎসা রটাচ্ছে। এ ছাড়া ওদের কিছু করার নেই। কিন্তু এতে কাজ হবে না কারণ সবাই জানে যে বিয়ের পর স্বামীর নামেই পরিচিতি ঘটে, স্ত্রীর। সে অর্থে আমি পুরোপুরি হিন্দু।

□ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনার বিরোধ কোন চরিত্রের?

□ -অবশ্যই রাজনৈতিক, নিন্দুকেরাই উল্টোপাল্টা প্রচার করেছে। রাজনৈতিক বিরোধ-এর ফলেই ও বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি আমি।

□ কিন্তু ইন্দিরা তো আপনার বিরুদ্ধে প্রচারে ব্যক্তিগত ব্যাপারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এমনকি....

□ -(বিরক্তভাবে) উনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন তাতে কিছু যায় আসে না।

□ ইন্দিরার মৃত্যু কি রাজীবের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বাড়াবে?

□ কখনোই নয়। ঐ সহানুভূতি অনেকটাই কেটে গেছে। আরও কাটবে কারণ পেটের প্রশ্নটা মানুষের কাছে অত্যন্ত তীব্র।

□ কংগ্রেস (ই) অনেক শক্তিশালী সংগঠন, সেক্ষেত্রে আপনার লড়াই-এর পথ কি?

□ কংগ্রেস শক্তিশালী তবে গুন্ডাদের সংগঠন। এই দেখুন না, আজই তো আমার গাড়িতে পাথর ছুঁড়েছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আছে গ্রামের সাধারন মানুষ। আমাকে ওরা নিজের লোক বলেই ভাবে।

□ বিরোধী ঐক্য সম্পর্কে....

□ ওরা আমাকে সাহায্য করছেন, আমি কৃতজ্ঞ।

□ কিন্তু সামগ্রিকভাবে......

□ (হেসে) দেখুন, সকাল থেকে অনেক বকবক করিয়েছেন তার উপর এতগুলো গ্রামে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে, আর কোন প্রশ্ন নয়। আটই ডিসেম্বর আবার আসছি। তখন আসুন বাকি কথা বলা যাবে।

□ কিন্তু আমাকে তো কালই ফিরে যেতে হবে।

□ আমি নিরুপায়।

□ আচ্ছা, শেষ প্রশ্ন। আর বিরক্ত করব না।

□ (হাই তুলে) বলুন।

□ নেহরু পরিবারের ট্র্যাডিশন মেনে বরুণকেও কি রাজনীতিতে নিয়ে আসতে চান?

□ (রাগতভাবে) প্লিজ, এসব প্রশ্ন করবেন না। বরুণ এখনও অনেক ছোট। আমি রাজনীতিতে এসেছি দায়িত্ব পালন করতে। বরুণ বড় হোক, ও নিজেই ঠিক করবে রাজনীতিতে আসবে কিনা। এখনই এ নিয়ে ভাবার সময় আসে নি। □

আমেথি ডায়েরি

আমেথি স্টেশনে নেমে যে কোন নবাগতর পক্ষে আশ্চর্য হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, পরিস্কার ঝকঝকে স্টেশন, টিকিট কাউন্টারের সামনের অংশটি যেন দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের মিনি সংস্করণ– যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য রঙীন ফাইবার গ্লাসের চেয়ারে মোড়া। আর রিটায়ারিং রুম! এমনভাবেই তা তৈরি যে উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত শীতও থমকে দাঁড়িয়ে থাকে জানলার বাইরে, এই ডিসেম্বর মাসেও। হলুদ টাইলে ঢাকা আরামদায়ক বাথরুম। স্টেশনে নেমে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার পন্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিলেন থাকার। আমেথি এখনও হোটেলহীন, পন্ডিতজীর উষ্ণ সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না শীতের রাত্রি কাটানো।

পন্ডিতজী ছাড়া আর পাবেন রিটায়ারিং রুম অ্যাটেনড্যান্ট এরশাদ খানকে। নিজে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সবচেয়ে ভালো খাবারের দোকান। এই শীতে লেপ কম্বল চাইলে তাও পাবেন খানের কাছে। আর ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে আপনাকে জাগিয়ে তুলবার জন্যও হাসিমুখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন খান।

সঞ্জয় গান্ধীর পরিকল্পনা মতো আমেথি স্টেশন বিল্ডিং তৈরির দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন মেহমুদ খান–একজন নামজাদা স্থপতি। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পরেই শুরু হয়েছিল কাজ। আর আজ বাইরের দুনিয়ার কাছে আমেথির উন্নয়নের বিজ্ঞাপন হিশেবে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্টেশনে।

স্টেশনের কাছে কংগ্রেস (ই)-র অফিস চত্বরে ঢুকতেই চোখে পড়ল অসংখ্য জিপ। অফিস থেকে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে সবে ক্যামেরা খুলেছি সঙ্গে সঙ্গে জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে বাধা দিলেন জনাচারেক যুবক। 'একটু ফাঁকা হোক তারপর ছবি তুলবেন' বলে সামনে এসে দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েন। জিপগুলি একের পর এক ছাড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যে বাইরে বেরিয়ে আসেন জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হরিশঙ্কর পাঠক। সব শুনে তিনি যুবকদের সরিয়ে ছবি তোলার অনুমতি দিয়ে চলে গেলেন ব্যস্তভাবে। ততক্ষনে চত্বর প্রায় ফাঁকা। নির্বাচনে জিপের ব্যবহার নিয়ে বিভিন্নমহলে অনেক কথা উঠেছে। জিপসহ অফিস প্রাঙ্গনের ছবি তুলতে দিতে এজন্যেই এত আপত্তি ছিল ঐ যুবকদের। ব্যস্ত হরিশঙ্কর পাঠকের সে খেয়াল নিশ্চয়ই ছিল না!

কালিকিন গ্রামে দেবীর মন্দিরটি অতি প্রাচীন। নিচ থেকে প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উচ্চতায় মাটির পাহাড়কে পাক দিয়ে উঠে গেছে এই মন্দির। রামগড় থেকে মেনকা তখনও এসে পৌঁছননি। সেই ফাঁকে উঠে পড়ি মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে। উঠতে হল জুতো খুলে। চামড়ার ব্যাগ নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি ছিল না। এর ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছলেন মেনকা। খালি পায়ে উঠে এলেন মন্দিরে। কিন্তু সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারদের সময় ছিল না অত নিয়ম মানার। কাঁধে চামড়ার ব্যাগও আছে। অবশেষে পূজো দিয়ে নেমে এলেন মেনকা, সঙ্গে আমরাও। চতুর্দিকে জুতোর ছাপ। হঠাৎই চোখ পড়ল পুরোহিতমশাইয়ের দিকে। কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছেন বেচারা। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে ক'ঘড়া গঙ্গাজল লাগবে কে জানে!

শিক্ষার সুযোগ নেই, নেই চাকরির সুযোগ –এরাও কি সেই ট্র্যাডিশন বহন করবে?

আগেকার আনস্মার্ট ভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন মেনকা। দেবীর মন্দিরে আবার দেখা হতেই হাত তুলে হাসলেন 'আছেন তো?' এই সুযোগে দু-চার কথা বলে নিই। পূজো দিয়ে বেরিয়ে এলেন মেনকা 'দেবীর আশীর্বাদ পেয়ে গেছি, খুব আনন্দ হচ্ছে।' মন্দির থেকে নেমে সভায় বক্তৃতা শুরু করতেই মাইকের গন্ডগোল শুরু হল। একবার-দুবার-তিনবার। শেষে বেশ বিরক্তির সঙ্গে চাপা গলায় বলে উঠলেন 'কি করে রেখেছেন এসব?' উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটা ত্রস্ত ভাব। চতুর্থবার ঝামেলা হতেই সরে দাঁড়িয়ে খালি গলায় বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন মেনকা। প্রবল হাততালিতে ভরে গেল সভা।

তবে ধৌরহরা গ্রামে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি তিনি। বাচ্চাকাচ্চারা অনেকক্ষন ধরেই চেঁচামেচি করছিল। ধমক দিয়েও তাদের চুপ করানো যায়নি। অবশেষে চেঁচিয়ে উঠলেন মেনকা, 'কেউ এসে উঠিয়ে দিন বাচ্চাদের'। এবার খানিকটা নিস্তব্ধতা। মেনকা তখন বর্ণনা করছেন কুরু-পান্ডবের যুদ্ধকাহিনী। বাচ্চারা একেবারে চুপ–তবে তা মেনকার ব্যক্তিত্বে নাকি গল্পের আকর্ষনে জানি না।

রাজীবের সঙ্গে এর আগে সোনিয়া এসে ঘুরে গেছেন আমেথি। ওষুধ বিলিয়েছেন দরিদ্র গ্রামবাসীদের, তবে নিন্দুকেরা বলে ঐ ওষুধ সোনিয়া নিজে আনেন নি। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ওষুধ-ব্যবসায়ি শঙ্করলাল শর্মার উপঢৌকন হিশেবে এসেছিল ঐ ওষুধ। ক'বছর আগেও অপরিচিত ছিলেন শর্মাজী, অবস্থাও ছিল না ভালো। হঠাৎই দ্রুতবেগে বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন শর্মাজী, ভাগ্যও ফিরে গেছে। সোনিয়ার ওষুধ বিলোনোর পিছনে শঙ্করলালের অবদানের কারন নিয়েও কথা শোনা যাচ্ছে। তবে নিন্দুকেরা তো অনেক কথাই বলে!

কোন জায়গাতেই কি কংগ্রেস (ই) ঝগড়াঝাটিগুলো একটু আস্তে করতে পারে না! একেই লোকসভা নির্বাচন তার উপর প্রার্থী স্বয়ং রাজীব–ফলে এখানে এখন হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা। তার কিছুটা এর তার পকেটে ঢুকতেই পারে, তা নিয়ে চেঁচামেচির কি আছে? কালিকিন গ্রামে এক চায়ের দোকানে কংগ্রেস (ই) নেতা যমুনা শুক্ল ঝগড়া করছিলেন চেঁচিয়ে। শুক্লজির বঞ্চনার পরিমাণ কত জানি না, কিন্তু কণ্ঠস্বর যে উচ্চতায় উঠেছিল তাতে মনে হয় পরিমাণটা নেহাত কম নয়। দোকানে তখন বেশ কিছু গ্রামবাসী উপস্থিত। ক্রুদ্ধ শুক্লজী বেরিয়ে যেতেই এক বৃদ্ধের মন্তব্য, 'শালা, কংগ্রেসবালে সির্ফ পয়সে কে লিয়ে লড়াই চালাতে হ্যায়।'

হায় বিকাশ! হায় উন্নয়ণ! সীতারাম (গ্রাম জারোটা)

সাতাত্তরে সঞ্জয় গান্ধীকে পরাজিত করে দেশে বিদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রপ্রতাপ সিং, রাজাভাইয়া নামে এখানে তাঁর পরিচিতি। সুলতানপুরে বি.জে.পি'র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রপ্রতাপ। কিন্তু শোনা যাচ্ছে মেনকারই বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রপ্রতাপ নাম প্রত্যাহার করে মেনকার পক্ষে প্রচারে নেমেছেন। কি অদ্ভূত এই রাজনীতির খেলা! তবে সত্যিমিথ্যে জানি না, শোনা যাচ্ছে যে মৌখিক চুক্তি হয়েছে এই শর্তে যে আমেথিতে জয়ী হলে মেনকা পদত্যাগ করে সিট ছেড়ে দেবেন রবীন্দ্রপ্রতাপকে। সুলতানপুরে জয়ের আশা না থাকায় রাজাভাইয়া সঠিক পথই বেছেছেন বলা যায় কারণ আমেথির সিট খালি হলে উপ-নির্বাচনে সঞ্জয় মঞ্চ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে জিততে খুব একটা অসুবিধে হবে না রবীন্দ্রপ্রতাপ সিং-এর।

তারাপুর থেকে ধৌরহরায় পৌঁছে মেনকা জানালেন কংগ্রেসী গুন্ডারা তার গাড়িতে পাথর ছোড়ায় তিনি গালে আঘাত পেয়েছেন। মূহূর্তের মধ্যে সভায় চাপা আওয়াজ উঠল ই-স্-স্। তবে আসার সময় পথে এরকম কোন ঘটনার কথা শুনি নি। মেনকার মুখেও ছিল না আঘাতের সামান্যতম চিহ্ন। তবে কে জানে, কত ঘটনাই তো সাংবাদিকদের চোখ এড়িয়ে যায়!

রণঞ্জয় সিং শুধু আমেথির ভূতপূর্ব রাজাই নন, আমেথি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী উত্তর প্রদেশের বণমন্ত্রী সঞ্জয় সিং-এর ব্যবাও বটে! প্রাসাদে এমনিতেই পাহারার কড়াকাড়ি, ইদানীং নির্বাচনের কারনে আরো বেড়েছে। কিন্তু একসকালে রণঞ্জয় সিং আবিস্কার করলেন চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে। দোতলার তোষাখানায় এত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে দরজা ভেঙে, আলমারি থেকে দশ লক্ষ টাকা সহ হীরে জহরত নিয়ে চোরের দল নির্বিবাদে পালাল কি করে এটাই আশ্চর্য! খবর পাওয়ামাত্র লক্ষ্ণৌ থেকে পুলিশ কুকুরসহ দৌড়ে গেছেন গোয়েন্দারা। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ঘটে যাওয়া এই চুরির তদন্ত চলছে।

আমেথিতে ফিরব বলে আন্তু স্টেশনে দুঘন্টার উপর বসে আছি ট্রেনের আশায়। অন্য উপায় নেই এক টাঙগা ছাড়া, তারাও এতদূরে যেতে রাজী নয়। অবশেষে ট্রেন এল। আমার সঙগে একই কামরায় যে লোকটি উঠলেন পরে আলাপ হতে শুনলাম তাঁর নাম রাজবাহাদুর মিশ্র, রবীন্দ্রপ্রতাপ সিং-এর গুণমুগ্ধ অনুচর। 'আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি সবজায়গায়তেই মেনকাজীর সঙগে স্টেজে বসেছিলাম, আমার ছবিও তুলেছেন আপনি', অভিমান করলেন মিশ্রজী। দু:খিত হওয়া ছাড়া কিছু করার নেই আমার। 'কিন্তু' ফিসফিস করে বললেন মিশ্রজী, 'আমার ছবি তো বেরবে সব কাগজে। সবাই চিনে ফেলবে আমায়। এদিকে মেনকাজী যদি হারেন তাহলে কংগ্রেস আমার অনেক ক্ষতি করে দেবে।' তাকে নিশ্চিন্ত করি এই বলে যে আমি অন্তত তার ছবি ছাপাব না। স্বস্তি পান মিশ্রজী। তারপরই তার উদাসীন প্রশ্ন 'আপকো রাজীব নে ভেজা হ্যায় ক্যেয়া?' শুনে তো চমকে উঠেছি 'তার মানে?' 'মেনকাজী বলছিলেন যে দিল্লী থেকে খুব খারাপ এক সাংবাদিক এসেছে, রাজীবই পাঠিয়েছে ওকে, এর আগেও ওরা মেনকাজীর নামে খারাপ কথা লিখেছে।' শুনে নিশ্চিন্ত হই, তাহলে আমি নই, কিন্তু কে হতে পারে? হঠাৎই মনে পড়ল 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক সুনীল সেঠির কথা। দুপুরে আলাপ হয়েছিল, দেখছিলাম মেনকা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সুনীলকে।

যাক, ইন্দিরার মত মেনকাও তাহলে বন্ধু ও শত্রু কাগজ বাছতে শুরু করেছেন। 'ইন্ডিয়া টুডে' এই দ্বিতীয় মিসেস গান্ধীর গুড বুক থেকেও বাদ। স্বীকার করতেই হবে এই একটা ব্যাপারে অন্তত মেনকা নিখুঁতভাবে অনুকরণ করছেন ইন্দিরাকে। □

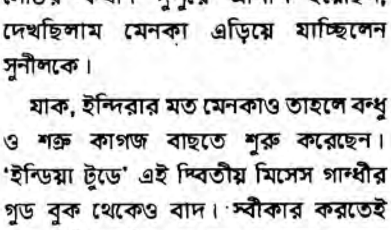

কেন্দ্র কানপুর (সিটি)

দাঙগাবিধ্বস্ত শহর জেগে উঠেছে নির্বাচনী উত্তেজনায়

জয় দাশগুপ্ত

কানপুরে পান্ডুনগর, রণজিৎনগর, নিরালানগর, রতননগর, জি.টি. রোডের আশপাশ অঞ্চল বাস্তবিকই গতমাসে ভুলিয়ে দিয়েছিল কানপুরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। দীর্ঘ চারদিন ধরে শিল্পনগরী কানপুর ভুগেছিল দাঙগার অসুখে। অক্ষত ছিল না অভিজাত নবীন মার্কেট। 'মিনি অমৃতসর' বলে পরিচিত অধিকাংশ শিখ অধ্যুষিত পাঁচ নং গুমটির অনেককেই আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল হিন্দুবন্ধুদের বাড়ি অথবা গুরুদ্বারে। শুধু লুটতরাজ অথবা অগ্নিসংযোগ নয়, কিংবা নয় শুধু নৃশংস হত্যা—এসবেরই যোগফল কানপুরকে স্থান দিয়েছিল দাঙগাবিধ্বস্ত রাজধানী দিল্লীর ঠিক পরেই। কত ছিল নিহতের সংখ্যা? সরকারি পরিসংখ্যানে যাই থাকুক না কেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীতে এই সংখ্যা ঘোরাফেরা করেছে তিনশ থেকে চারশ'র এক আতঙ্কজনক গন্ডীতে।

গলি ও রাজপথ থেকে রক্তের দাগ মুছে গেছে ধীরে ধীরে। শুধু শিখ নয়, লুণ্ঠিত মালের কোন জাত না থাকায় বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলিম দোকানদারও রেহাই পান নি লুটের হাত থেকে। অসংখ্য শিখের সঙেগ তারাও ক্ষয়ক্ষতির হিশেব শেষে হাত লাগিয়েছেন নতুন করে দোকান গড়ে তুলতে। এ দৃশ্য নবীন মার্কেটে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশী। কিছু শিখ পরিবার পাড়ি দিয়েছেন পাঞ্জাবে কিন্তু অধিকাংশই বিগত দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে চেষ্টা করছেন নতুনভাবে উঠে দাঁড়াতে।

চারদিন পর সচল হয়েছিল রাষ্ট্র। অথবা বলা যায় লুটেরাদের ক্লান্তিই তাকে সুযোগ দিয়েছিল নড়েচড়ে বসতে। লুটেরাদের কোন জাত ছিল না অথচ সন্দেহ, নিন্দা ও নির্যাতনের সবচেয়ে বড় শিকার হলেন কানপুরের ঈদগা কলোনির হাজার দুয়েক হরিজন। স্টেশন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মনগর-এর উল্টোদিকে এই ঈদগা কলোনি, যার বাসীন্দা হরিজনরা মূলত যুক্ত নগর মহাপালিকায় জঞ্জাল সাফের কাজে। পান-বিড়ির দোকান আছে ক'একজনের, কেউবা গড়ে তুলেছেন ব্যান্ডপার্টি, উৎসবে মিছিলের আগে এদেরই দেখা যায় জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর বাজিয়ে যেতে। সাম্প্রদায়িক দাঙগা এবং লুটপাটের পুরো দায়িত্ব এদের উপর চাপিয়ে দেওয়ায় তথাকথিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে এদের অভিমান, ক্ষোভ। কলোনির সামনে লেখা 'হম চোর হ্যায়, ডাকু হ্যায়; হমারে পাস ভোট মাঙগনে মত আইয়ে'-শব্দটি শহুরে সভ্যতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ।

অন্যদিকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ

নরেশ চতুর্বেদী—কং (ই)

থেকে নির্বাচনের নিয়মমাফিক উত্তেজনায় জেগে উঠলেও শহর তথা নিজেদের উন্নতি বিষয়ে সাধারণ মানুষ সিনিক হয়ে পড়েছেন। ভরসা হারিয়েছেন নির্বাচিত জনপ্রতি-নিধিদের উপর। আর এই চাপা ক্ষোভের আঁচ পেয়েই '৮০-র নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস (ই) প্রার্থী আরিফ মহম্মদ খান কানপুর (সিটি) কেন্দ্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অন্য কেন্দ্রে। দিল্লীতে রাষ্ট্রমন্ত্রী (শক্তি) পদে আসীন আরিফ মহম্মদ খানকে কানপুরে গত নির্বাচনের পর থেকে আর দেখা যায়নি বিশেষ, এই অবহেলাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য তৈরি ছিল কানপুর। খান সাহেব পালিয়ে বেঁচেছেন, ফলে কংগ্রেস (ই)কে বাছতে হয়েছে নতুন প্রার্থী—শহরের কংগ্রেস (ই) সভাপতি নরেশচন্দ্র চতুর্বেদীকে। কবি ও সাংবাদিক শ্রীচতুর্বেদী এখন ব্যস্ত কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D-র জন্য তাঁর গবেষণাপত্র শেষ করার কাজে। উত্তরপ্রদেশে একজন কংগ্রেসী কর্মী হিশেবে বহু পরিচিত শ্রীচতুর্বেদীর ভদ্রলোক ইমেজকে কাজে লাগাতে চাইছে কংগ্রেস (ই)। কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেছিল বিরোধিরা কোন নির্বাচনী ঐক্যে আসতে না পারায়। নরেশ চতুর্বেদীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে দাঁড়িয়েছেন জনতা পার্টির সাধারন সম্পাদক সাহাবুদ্দিন। হাপুর কেন্দ্র থেকে তড়িঘড়ি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে সাহাবুদ্দিন কানপুর (সিটি) কেন্দ্রকে বেছে নেওয়ায় বিপাকে পড়েছে কংগ্রেস (ই), কারণ ভোটারদের মধ্যে হিন্দুব্রাহ্মণ ও মুসলমান ভোট প্রায় উনিশ-বিশ। ফলে মুসলমান ভোট সাহাবুদ্দিন টেনে নেবার পর যে ব্রাহ্মণ ভোট পড়ে থাকবে তাতে বেশ খানিকটা ভাগ বসাবেন বি.জে.পি'র সোমনাথ শুক্ল। পাশাপাশি আছেন ডি.এম.কে.পি'র শ্যাম মিশ্র। এছাড়া হিন্দুদের একটা অংশের ভোট পাওয়া সম্পর্কে জনতা পার্টি নিশ্চিত। হরিজন ও অনুন্নত শ্রেণীর ভোটের একচেটিয়া দাবীদার কেউই নয়। যদিও কংগ্রেস (ই) এদের একটা বড় অংশের সমর্থন পাওয়ার জন্য আশাবাদী। পাশাপাশি কংগ্রেস (ই)-কে চিন্তায় ফেলেছে ভোটারদের মধ্যে বেশ ভালো পরিমাণে (প্রায় বত্রিশ হাজার) শিখদের উপস্থিতি। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দায়ভাগ এড়িয়ে যেতে পারবে না কংগ্রেস (ই)।

অন্যদিকে কানপুর (সিটি)-র নির্বাচনে একটা বড় ভূমিকা শহরে শ্রমিকদের। যদি আমরা পিছন ফিরে তাকাই, দেখতে পাব যে ১৯৫২-র প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের হরিহর নাথ শাস্ত্রী ছিলেন শ্রমিক নেতা। পরবর্তীকালে ১৯৫৭-১৯৭১-এই চারটি নির্বাচনে জয়ী এস.এম. ব্যানার্জিও পরিচিত ছিলেন শ্রমিকনেতা হিশেবেই। প্রথমে নির্দল প্রার্থী হিশেবে জিতলেও পরবর্তীকালে ভারতের কমুনিস্ট পার্টি তার গায়ে লাগিয়ে দেয় 'কম্যুনিস্ট' চিহ্ন এবং '৭৭-এর জনতা হাওয়ায় ব্যানার্জির

সাহাবুদ্দিন–জনতা পার্টি

জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর সেই চিহ্নটিকে দ্রুত মুছে দিতে দেরি করে নি সুবিধেবাদী সি.পি.আই। কিন্তু এবারের নির্বাচনে শ্রমিকনেতা বলে পরিচিত একমাত্র প্রার্থী ডি.এম.কে.পি'র শ্যাম মিশ্র সি.পি.আই ও সি.পি.এম–এর সমর্থন সত্বেও কতখানি শ্রমিক সমর্থন পাবেন সন্দেহ আছে।

ক্লোজার, লক-আউট, স্ট্রাইক–এর ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাদ পড়েনি কানপুরও। ট্যানারি, জুতোর কারখানা, টেক্সটাইল মিলস ছাড়া হোসিয়ারি শিল্পেও কানপুর সমৃদ্ধ। বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে জে.কে ম্যানুফ্যাকচারারস ও জে.কে.রেয়নস। সরকারি পরিচালনাধীন ট্যানারি অ্যান্ড ফুটওয়্যার কোম্পানি (ট্যাফকো), এলগিন মিল, মজুর মিল কিংবা লাল ইমলি দিনের পর দিন প্রসব করে চলেছে লোকসান। স্বদেশী মিল–এর ঝামেলা মেটেনি এখনও। একের পর এক নেতা এসেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু তাতে সমস্যার সুরাহা হয়নি। বঞ্চিত স্বদেশী শ্রমিকরা তাই ভাবছেন নির্বাচন বয়কটের কথা।

প্রতিটি দলই নেমেছে শ্রমিক সমর্থন আদায়ের প্রচারে। এ.আই.টি.ইউ.সি বেশ শক্তিশালী কানপুরে। সি.আই.টি.ইউ–র সঙ্গে তাঁরা ঘুরছেন ডি.এম.কে.পি প্রার্থীর প্রচারে।

কানপুরে প্যারাসমাইট রাজনীতির বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন এই শ্রমিক ভোট সংগ্রহের আশায় সব প্রার্থীই মরিয়া, ফলে নির্বাচনের অতি প্রচারিত ইস্যু 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' নিয়ে চাপান-উতোরের পাশাপাশি প্রত্যেককেই যেতে হচ্ছে কারখানাগুলোতে। তবে শক্তিশালী আই.এন.টি.ইউ.সি–র প্রচার সত্বেও কংগ্রেস (ই) শ্রমিক সমর্থন বিষয়ে খুব একটা নিশ্চিত নয়।

সোমনাথ শুক্ল–বি.জে.পি

প্রচারের দিক থেকে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আসরে নেমেছিল কংগ্রেস(ই)। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই চোখে পড়েছে রাস্তায় রাস্তায় কংগ্রেস (ই)–র গাড়ির সারি। এক দুপুরে নঈ সড়ক-এ দেখেছিলাম প্রায় কুড়িটি কংগ্রেসী জিপ ও টেম্পো দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রচারে বেরনোর আগে। সবচেয়ে সামনের গাড়িতে সিটে হেলান দিয়ে একটি ছেলে তুড়ি মেরে গাইছিল 'মেরে অংগনেমে তুমহারা কেয়া কাম হ্যায়'। লোকজন জমছিল আশেপাশে। নঈ সড়ক ছাড়াও পেচ বাগ, মেডিকেল কলেজ রোড, স্বরূপনগর, আর্যনগর, সিভিল লাইন্স, জাজ মউ সব জায়গাতেই চোখে পড়েছে দলীয় পতাকা ও মাইক লাগানো জিপ-টেম্পো এবং ছোট ছোট স্লোগান স্কোয়াড। শহরের প্রাণকেন্দ্র মল রোডও এর ব্যতিক্রম নয়।

যদিও নির্বাচনী উত্তেজনা আশ্চর্যজনক-ভাবে অনুপস্থিত যুবকদের মধ্যে। এই যুব বাহিনীর অভাবই বোধহয় বাড়তে দেয়নি দেওয়াল লিখনের সংখ্যা। ব্যস্ত শহর কানপুর ব্যস্ত রেখেছে যুবকদেরও, রকে বসে আড্ডা মারাও চোখে পড়েছে কদাচিত। কলকাতা থেকে এসে চামড়ার ব্যবসা করছেন মানিক গুপ্ত, তাঁর মতে, 'কাজের পর যেটুকু সময় বাঁচে সে সময়টুকু এখানকার ছেলেরা চেষ্টা চালায় অন্য কোন ধান্দার। টাকা রোজগারেই ব্যস্ত প্রত্যেকে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ব্যাথাও কম। কলকাতার মত ইয়ং ছেলেদের খুব বেশি এখানকার মিটিং মিছিলে পাওয়া যাবে না।' একটু নজর করলেই কথাগুলোর সত্যতা বোঝা যায়।

৯ ডিসেম্বর জনতা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাহাবুদ্দিনের সমর্থনে কানুপর ঘুরে যাওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছে জনতা পার্টি। রাজনীতি ছাড়াও সাহাবুদ্দিনের রয়েছে অতীত গ্ল্যামার। সরকারি কাজে বহুদিন থেকেছেন বিদেশে। '৭৫-'৭৮–এই সময়ে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব। '৭৮ এ যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে। ধর্মনিরপেক্ষ বলে নিজেকে প্রমাণ করতে সাহাবুদ্দিন মুসলমান এলাকাগুলি এড়িয়ে মূলত প্রচার চালাচ্ছেন সেখানে যেসব জায়গায় হিন্দু-মুসলমান-শিখ একত্রে বাস করছেন। গতমাসে শিখদের হেনস্থা সংখ্যালঘু হিশেবে মুসলমানদেরও সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে কং (ই) সম্পর্কে। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটের প্রধান অংশটা পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সাহাবুদ্দিন এবার নজর দিয়েছেন অন্যদিকে।

বি.জে.পি-র সোমনাথ শুক্ল কারখানাগুলিতে মিটিং করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন শ্রমিকদের উপর সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিকার করার এবং বন্ধ কারখানা খোলার। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বভাবতই তাঁর চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব আছে শ্রমিক নেতা শ্যাম মিশ্রর। তার উপর এ.আই.টি.ইউ.সি ও সি.আই.টি.ইউ-র সমর্থনও আছে তার পিছনে।

তবে নির্বাচনে জয় যাঁরই হোক না কেন তাঁকে নজর দিতে হবে কানপুরে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা কমিয়ে আনার দিকে। স্মাগলড্ গুডসের ঠেক রামানি মার্কেট–এর দখলদারি নিয়ে দুই ভাই আকিল-ফাঈম–এর সংগে ইয়াসিন খলিফা দলের লড়াইয়ে শহর আতঙ্কিত। এর আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কুরেশি পরিবারের সংগে লড়াই–এ জিতেছে আহমেদ ভাইয়েরা–আকিল ও ফঈম। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কুরেশি পরিবার। এবার লড়াই দুই ভাই বনাম ইয়াসিন খলিফা। কানপুরে আমি থাকার সময়ই সন্ধ্যেবেলা খলিফার অনুচর হাজি লায়েক খুন হল নঈ সড়ক–এ। পরেরদিনই পুলিশের সংগে সংক্ষিপ্ত গুলিবিনিময়ের পর ফঈম ধরা পড়ে বিয়াল্লিশতম খুনের অভিযোগে। তবে অন্যান্যবারের মতো এবারও সাক্ষীর অভাবে ফঈম ছাড়া পাবে বলে সকলের ধারনা। স্মাগলিং ছাড়াও উত্তর প্রদেশের ডাকাতদের অস্ত্রশস্ত্র জোগানোও দুভাইয়ের আরেক ব্যবসা।

ক'একমাস আগে নতুন এস.পি (সিটি) রাজাগোপালাচারি ও ডি.আই.জিডি.এস্–বেদি শক্ত হাতে অপরাধ দমনের জন্য নেমেছেন। কিন্তু পুলিসের প্রতিটা স্তরের দুর্নীতি কোন কার্যকরী পদক্ষেপে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরেকটা অভিযোগ শোনা গেল নগর মহাপালিকা সম্পর্কে। রাস্তাঘাট সারানো বা পরিষ্কারের কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিতে

ব্যর্থ হয়েছে নগর মহাপালিকা। চোখে পড়েছিল রাস্তায় ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হচ্ছে, কলকাতার সঙ্গে তুলনা করে অবাক লেগেছিল। 'এ শুধু ভোটের জন্য'–ভুল ভাঙালেন একজন। কলকাতা কর্পোরেশনের চাইতে ঘুষের পরিমাণ এখানকার নগর মহাপালিকায় অনেক বেশি। তবে শোনা গেল, তাতে কাজটা অন্তত হয়। একই অবস্থা সরকারি অফিস ও ব্যাঙ্কেও–শুধু কলকাতা নয়, দায়িত্বসচেতনতার অভাব ও আলস্যবোধ জড়িয়ে ধরেছে কানপুরকেও।

কানপুর (সিটি) কেন্দ্র ছাড়া কানপুরের অন্য দুটি লোকসভা কেন্দ্র বিল্হর ও ঘাটামুর-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোটামুটিভাবে দ্বিমুখী। প্রথমটিতে কংগ্রেস (ই)র জগদীশ আওস্থির সঙ্গে লড়াই কংগ্রেস (জ)-র রঘুনাথ সিং-এর। সি.পি.আই ও সি.পি.এম সমর্থন করছে সিংকে। এ লড়াই মূলত ব্রাহ্মণ বনাম ঠাকুর সম্প্রদায়ের লড়াই। ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত সিং '৮০ তে হেরেছিলেন মাত্র পাঁচহাজার ভোটে। এবার তারই জেতার সম্ভাবনা বেশি।

অন্যদিকে ঘটাপুর (সংরক্ষিত) আসনটির

শ্যাম মিশ্র–ডি.এম.কে.পি।

জন্য তফশিলী ও অনুন্নত শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট ডি.এম.কে.পি'র কেশরিলাল কুরিল দুশ্চিন্তায় ফেলেছেন কংগ্রেস (ই)-র আসকরন সাঙ্খোয়ারকে। প্রায় ছ'লাখ ভোটার অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে ঠাকুর-ব্রাহ্মণ রেষারেষি সত্ত্বেও প্রধান ভূমিকা নেবে তফশিলী ও অনুন্নত শ্রেণীদের ভোট।

একটি লোকের কথা না বলে কানপুরের নির্বাচনী সংবাদ শেষ করা যায় না। লোকটির নাম ভগবানপ্রসাদ দীক্ষিত। কানপুর (সিটি) কেন্দ্রে শ্রীদীক্ষিত বহুদিন ধরে পরিচিত 'ঘোড়েওয়ালে' নামে, পরিচিত আমেথিতেও। ওখানেও দাঁড়িয়েছেন তিনি। দাঁড়িয়েছেন রায়বেরিলিতে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধেও। এমনকি চারবার রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে চেয়েও পারেন নি নমিনেশন পেপার ক্যানসেল হয়ে যাওয়ায়। কাজ করতেন নগর মহাপালিকায়। বেআইনি বাড়ি ভাঙার হুকুম পেয়ে সম্মুখীন হন ঘুষের। কিন্তু তা না নিয়ে গোঁয়ারের মত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গোপন হাতের খেলায় চাকরিটা খোয়ান। তারপর থেকেই দাঁড়াচ্ছেন নির্বাচনে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রচারমত শ্রীদীক্ষিত কানপুরে বাচ্চা বুড়ো সকলের কাছেই পরিচিত রবীনহুড নামে। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে পেয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার ভোট, জামানত জব্দ হয়েছিল বিখ্যাত এস.এম.ব্যানার্জির। ভোটে না জিতলেও ব্যানার্জিকে হারিয়েই খুশী হয়েছিলেন 'ঘোড়েওয়ালে', বাকি প্রতিবারই তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তাঁর প্রতীক 'ঘোড়ার উপর মানুষ' কে দেখিয়ে যদি প্রশ্ন করেন 'এ প্রতীক কেন?' তাঁর জবাব আসবে 'যদি পাঁচশটা গাধা পার্লামেন্টে যেতে পারে, তবে একটা ঘোড়াও পারবে'। প্রিয় ঘোড়া মতির পিঠে চড়ে যুবকের উৎসাহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 'ঘোড়েওয়ালে'–ভগবানপ্রসাদ দীক্ষিত। □

বিগত ৭-টি নির্বাচনে দলগত অবস্থা

	১৯৫২		১৯৫৭		১৯৬২		১৯৬৭		১৯৭১		১৯৭৭		১৯৮০	
দল	প্রার্থী	মনোনীত	প্রার্থী	মনোনীত	প্রার্থী	মনোনীত	প্রার্থী	মনোনীত	প্রার্থী	মনোতীত	প্রার্থী	মনোনীত	প্রার্থী	মনোনীত
কংগ্রেস H	৪৬৯	৩৫৪	৪৮৩	৩৬৬	৪৮৫	৩৫৮	৪৫২	২৮০	৪১০	৩৫৫	৪৯৩	১৫৩	৪৮৬	৩৫১
পি.এস.পি	৪০০	২০	১৭৫	১৮	১৬৮	১২	১১০	১৩	৬০	–	–	–	–	–
সি.পি.আই	৬৯	২৬	১১৫	২৯	১৩৭	২৯	১০১	২৩	৭১	২৪	৯	৭	৫০	১১
জনসঙ্ঘ	৯১	৩	১০৩	৪	১৯৬	১৪	২৩৫	৩৬	১৬২	১৬	●	●	2●	●
স্বতন্ত্র	–	–	–	–	–	১৭৩	১৮	৭৭	৪২	৬০	৮	–	–	–
রিপাবলিক	–	–	–	–	৬৮	৩	৬৬	১	৪৬	–	২	২	–	–
সি.পি.আই	●	●	●	●	●	●	৫৭	১৯	৫০	২৬	৫০	২২	৬০	৩৫
এস.এস.	–	–	–	–	–	–	১১৯	২৩	৮৯	৩	●	●	●	●
অকাল দল	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৩	১	৪	–	–
ডি.এইচ.	–	–	–	–	–	–	–	–	৩	–	–	–	–	–
কংগ্রেস ()	–	–	–	–	–	–	–	–	২০৫	১১	●	●	●	●
কংগ্রেস ()	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২১০	১৩
মুসলিম লী	–	–	–	–	–	–	–	–	১০	৩		২		২
জনতা	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৪২৩	২৯৯	৪২০	৩১
এ.আই.এ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৯		
লোকদল	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২৯২	৪১
নির্দল	৯৪৬	৮৩	৫৮০	৭১	৭১৬	৪৪	৬৭০	৪৪	৭২৬	৪৪	১২২৭	২৭	২৭৩৬	৬

বাঁকুড়া – বিষ্ণুপুর

নির্বাচন জয়ের চাবিকাঠি অনুন্নত সম্প্রদায়ের হাতে

পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অঞ্চলগুলোর কথা উঠলেই সর্বাগ্রে মনে আসে বাঁকুড়া জেলার নাম। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও একটিও সতিকারের ভারি শিল্প গড়ে উঠলো না রাঙা মাটির এই দেশটাতে। শুধু মাত্র রাস্তাঘাট বা পরিবহণ ব্যবস্থাই নয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল ধরা পড়ে এখানকার ভূমি সম্পর্ক প্রভৃতিতে। বন্যা, খরা, জলাভাবে চাষবাস বন্ধ ইত্যাদি বাৎসরিক নিয়মে পর্য্যবসিত হয়েছে। বহু মানুষ বছরের অধিকাংশ সময় অন্যত্র কাটাতে বাধ্য হন রুটি রোজগারের সন্ধানে।. নতুন নতুন পরিকল্পনা না থাকায় এখানে বেকার সমস্যা দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধি। আদিবাসী, উপজাতি, তপশীল সম্প্রদায় অধ্যুষিত বাঁকুড়া জেলার ভোটাররা আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন না হলেও নির্বাক। এ প্রসঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করলেও বাইরের লোক দেখলেই শামুকের মত গুটিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত, বাইরের লোক যখন শহুরে বাবু। মড়ার গ্রামের বিধু সরেনের ভাষায়,'ভোট দিতে হয় তাই দেই। রাজনীতি মোরা বুঝিনে। সমবচ্ছর মোদের যে দ্যাইখে, খাইতে দেয়, ভোটের কালে মোরাও তাদের দেখি।' তবে এবার এদের হাতেই ঝুলছে দুই প্রধান দলের ভাগ্য। প্রকৃত শিক্ষিতের হার এত নীচে যে রাজনৈতিক সচেতনতা বলতে যা বোঝায় তা এই জেলার অধিকাংশ ভোটদাতার প্রায় নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক গিমিক বোঝার ক্ষমতা এদের খুব অল্প। প্রাক-নির্বাচনী হাওয়া বা পার্থিব সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে এরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। সেই কারণে, এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোট আসন্ন নির্বাচনে কোন দলের পক্ষে যাবে তা আগে ভাগে আন্দাজ করা দুষ্কর।

বিগত ফলাফল ঃ

বাঁকুড়াজেলায় লোকসভা কেন্দ্র দুটি – বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর (তপঃ) ১৯৮০-এর লোকসভা নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রেই বামফ্রণ্ট সমর্থিত সি পি এম প্রার্থীরা জয়ী হন।

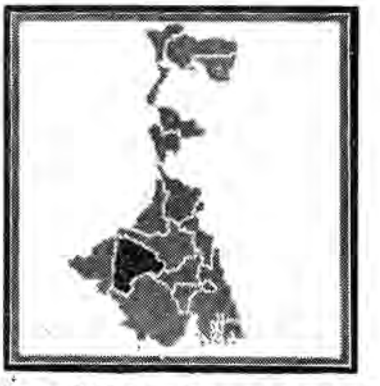

বাঁকুড়ায় সি পি এম-এর বাসুদেব আচারিয়া নিকটতম কংগ্রেস প্রার্থী শংকর নারায়ণ সিং দেওকে পরাজিত করেন ৪৩৯১১ ভোটের ব্যবধানে। এবং বিষ্ণুপুরে সি পি এম-এর অজিত সাহা কংগ্রেসের তুলসী দাস মন্ডলের চেয়ে ১,১৩,০০০ ভোট বেশি পেয়ে, লোকসভায় নির্বাচিত হন। সি পি এম এই দুই বিজয়ী প্রার্থীকেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে টিকিট দিয়েছে। পক্ষান্তরে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে বামফ্রণ্টের প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস প্রার্থীরা হলেন

অমিত মুখার্জী

যথাক্রমে ডাঃ অরুণ ভট্টাচার্য ও গৌরচন্দ্র লোহার। আগামী নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ১৪,৪৪২০৫। ৮২-এর নির্বাচনের পর নতুন ভোটার বেড়েছে ১,২০,২৩১। বাঁকুড়া (সদর) নির্বাচনী বুথ সংখ্যা ১৩২৬ এবং বিষ্ণুপুরে ৫২৯। অর্থাৎ সমগ্র জেলায় মোট বুথ সংখ্যা ১৮৫৫। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী অফসার ও হোমগার্ড সহ ৫২৩৬ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে। বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া কেন্দ্রে মোট প্রার্থী সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ এবং দশ। উভয় কেন্দ্রেই প্রধান দল সি পি এম ও কংগ্রেস এবং বাঁকুড়ায় এস ইউ সি-বাদে সকলেই নির্দল।

যে যেখানে দাড়িয়ে ঃ

নির্বাচনের মাত্র দিন কয়েক আগে এই দুই কেন্দ্রের জনসাধারণের মনে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় আকারে দেখা দিয়েছে তা হল, এবারের নির্বাচন কেমন হবে? ৮০-এর মতো এবারও কি সি পি এম একতরফা জিতে যাবে, নাকি কংগ্রেসের শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ সি পি এম-কে বিপাকে ফেলবে? প্রাক নির্বাচনী পরিস্থিতি এবং স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আসন্ন অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে এই দুই কেন্দ্রে লড়াই বেশ জমবে। বামফ্রণ্টের নির্বাচনী প্রচার পদ্ধতি কংগ্রেসের অন্যতম 'প্লাস পয়েন্ট'। বিভিন্ন মিছিল, মিটিং এবং দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে জনসমক্ষে যে সব ইস্যুগুলো বামফ্রণ্ট তথাসি পি এম বড় আকারে দেখাচ্ছে তাহল, সাম্রাজ্যবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও স্বৈরতন্ত্র দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু, পাঞ্জাব ও আসাম সমস্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কাশ্মীরে রাজ্য সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার কেন্দ্রীয় চক্রান্ত, বংশানুক্রমিক শাসনেরপ্রতিষ্ঠা ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের কবর সাজাচ্ছে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের গতি স্তব্ধ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত প্রভৃতি। সি পি এম আরো বলছে, এটা লোকসভার নির্বাচন বলেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ইস্যু এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার ভিত্তিতেই জনগণকে ভোট দিতে হবে। এই নির্বাচনে রাজ্য বা স্থানীয় ইস্যুর মোটেই প্রাধান্য নেই। অনেকে মনে করেন, সি পি এম-এর ভুল এখানেই। শহুরে বা শিক্ষিত ভোটারদের মনে এই সমস্ত ইস্যুগুলো রেখাপাত করলেও বাঁকুড়ার মত অনুন্নত সম্প্রদায় অধ্যুষিত জেলায় ও অশিক্ষিত ভোটারদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করবে না। কারণ, এসব-ব্যাপার নিয়ে তারা আদৌ চিন্তিত নয়। সি পি এম-এর এই ভ্রান্ত নীতির ফয়দা তুলেছে কংগ্রেস নির্বাচনে মূলত স্থানীয় ইস্যুগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকারের ব্যর্থতা শহরের মানুষদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গত কয়েকটি উপ নির্বাচনের ফলাফল এর প্রমাণ। শহুরেভোটারদের এই ক্ষোভ আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের হাত শক্ত করবে। কিন্তু বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে শহুরে ভোটার সংখ্যায়

খুবই অল্প। আসন্ন নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারণ করবে গ্রামের ভোট এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। আরএই ভোটের বেশির ভাগই পড়ে সি পি এম-এর পক্ষে। সি পি এম-এর বিপ্লবী চরিত্র এদের কাছে আজও অম্লান। কিন্তু সি পি এম-এর 'ভোট ব্যাঙ্ক' এই গ্রামের ভোট এবার কিছুটা কমতে পারে। যার পূর্বাভাস মিলেছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। সংখ্যায় সিট কম পেলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের হার বেড়েছে অনেক। যেমন বিষ্ণুপুরে কংগ্রেস পায় ৪৬% ভোট এবং সি পি এম ৫৪%। সি পি এম-এর ভোট বাড়লেও বৃদ্ধির হার তুলনায় কম। এদের মতে, বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েতের দুর্নীতি-এর জন্য দায়ী।

১৯৮০-এর লোকসভা নির্বাচনের পর ৮২-এর বিধানসভা নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস ভোটের ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে এনেছে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর লোকসভা সাতটি করে বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত। বাঁকুড়া কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা যথাক্রমে – পারা (তফঃ সং), রঘুনাথপুর (তফঃ সং), কাশীপুর (আদিবাসী সং), হুড়া, ছাতনা, বাঁকুড়া ও ওন্দা। এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র তালডাংরা, রাইপুর (আদিবাসী সং), রাণীবাঁধ (আদিবাসী সং), ইন্দপুর (তপঃ সং), বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর ও ইন্দাস (তফঃ সং), এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত। ৮২-এর নির্বাচনে ১৪টির মধ্যে ১৩টি সিটেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিজয়ী হন। একমাত্র বাঁকুড়া কেন্দ্রে সি পি এম-এর পার্থ দে-কে পরাজিত করে সিটটি ছিনিয়ে নেন কংগ্রেসের কাশীনাথ মিশ্র। ৮২-বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে ফ্রন্টের ভোট বাড়ে ৪২৯৮০। তুলনায় কংগ্রেসের বাড়ে ৪৩৫৬৭। কিন্তু বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ফ্রন্টের ভোট কমে ৬৭টি, অপরদিকে কংগ্রেসের ভোট বাড়ে ২৪৫২৪।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আসন্ন নির্বাচনে অনুন্নত সম্প্রদয়ের ভোট 'ডিসাইডিং ফ্যাকটার'। এই ভোটের শতকরা ৯০ ভাগ পোলিং হয়। সকাল থেকে রোদ মাথায় করে বিকেল পর্যন্ত এরা ভোট দেয়। বড় লাইনও পড়ে। সাধারণ কাস্টের মধ্যবিত্ত ভোটাররা এদের সাথে ভীড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে সাধারণত ভোট দেয় না। ফলে এদের ভোট নষ্ট হয়। সেইজন্য প্রদত্ত ভোটের সিংহভাগ অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিরাট ভোটকে 'মবিলাইজ' করে নিজেদের পক্ষে আনতে সি পি এম এবং কংগ্রেস উভয়েই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে আদিবাসী ও তফশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০% ও ৪৫%। সকলেই প্রায় ক্ষেত মজুর। পরের জমিতে চাষ করে সামান্য যা পায় তাতেই সংসার চালায়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এদের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। ফ্রন্ট সমর্থিত মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনের ফলে ক্ষেত মজুরদের বর্তমান রোজ আট থেকে দশ টাকা। বছর দশেক আগেও এত টাকার কথা এরা চিন্তাই করতে পারত না। এসব মানুষের কাছে সি পি এম গরীবের পার্টি হিসাবে পরিচিত। সাধারণ হিসাবেই এই ভোটের সিংহ ভাগ পেয়ে আসছে সি পি এম তথা বামফ্রন্ট।

ভোট ভাঙবে কে ?

সি পি এম-এর এই একচেটিয়া প্রতিপত্তিতে ভাগ বসিয়েছে ছোট দুটি দল – এস ইউ সি ও ঝাড়খণ্ড। বাঁকুড়া লোকসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর, পারা, কাশীপুর এবং হুড়ার কোন কোন অঞ্চলে এস ইউ সি-র শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। আদিবাসী অঞ্চলে এদের প্রভাব আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্টকে ভাবাবে বলে অনেকের ধারণা। ৮০-এর নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী আশুতোষ ব্যানার্জী বাঁকুড়া কেন্দ্রে ভোট পান ৩৬,১৫৯। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আগামী নির্বাচনেও বাম ভোটের বেশ ভালো একটি অংশ এস ইউ সি কেটে নেবে। এবার দলের প্রার্থী হয়েছে মঞ্জু চক্রবর্তী। এস ইউ সি বাম ভোটে ভাগ বসালে তা পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকেই সহায়তা করবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে বিজাপুর কেন্দ্রে সি পি এম-কে জব্দ করতে ঝাড়খণ্ডের সাথে কংগ্রেসের তলেতলে একটি আঁতাত হয়েছে। রাণীবাঁধ অঞ্চলের ঝাড়খণ্ড নেতা কবি কয়ালের সাথে কিছুদিন আগেই একটা পাকাপাকি রফা হয়ে গেছে। সেই অনুযায়ী কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালাচ্ছে ঝাড়খণ্ড।

তবে, এই বিশ্লেষণের রেখা চিত্র বদলে যেতে পারে। এবং এটা একমাত্র সম্ভব ঠিক নির্বাচনের মুখে প্রচুর টাকা বা গম যদি ওড়ে তবেই। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ যে বাঁকুড়া জেলায় ঠিক নির্বাচনের মুখে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, ৫০ লাখ টাকা এবং ১৩৩ মেট্রিক টন গম জনগণের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। স্থানীয় এক ব্যাঙ্ক কর্মীর, অভিযোগ, প্রত্যেকটি ব্লক পিছু বরাদ্দ হয়েছে ৮ লাখ টাকা। প্রচুর টাকা এবং গম যে ব্যাপক পরিমাণে উড়ছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ বাঁকুড়ার কংগ্রেস বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্র। তিনি অভিযোগ করলেন, আসন্ন নির্বাচনে ভরাডুবির পূর্বাভাস পেয়ে যথেচ্ছ পরিমাণে গম ও টাকা ছড়িয়ে সি পি এম ভোট কিনতে চাইছে। ওরা নির্বাচনের আইনকানুন কিছুই মানছেন না। উনি আরো জানালেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার, মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে এই ঢালাও বিলির প্রতিবাদ করে চিঠি পাঠিয়েছেন। কাশীবাবুর অভিযোগ বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে যে কেন্দ্রীয় সাহায্য আসে তা সময় মত খরচ না করে এখন ভোট কেনার কাজে ব্যয় হচ্ছে। উনি দায়িত্ব নিয়ে বললেন, এস সি ও এস টি-দের জন্য স্রেফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে যে কেন্দ্রীয় রিলিফ এসেছে তার স্টেটমেন্ট-এ খরচ

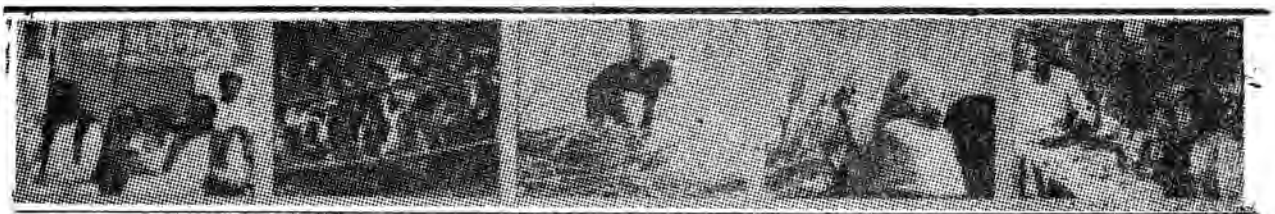

দেখানো হলেও আদৌ খরচ হয়নি। সে টাকাও খরচ হচ্ছে ভোট কেনার কাজে। ইউ বি আই-এর বিষ্ণুপুর শাখার জনৈক কর্মী বললেন, নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরই ব্যাঙ্কে ঝামেলা আরো বেড়েছে। রোজই পঞ্চায়েতের নেতারা বাছাবাছা লোক এনে লোন দেবার দাবি জানাচ্ছে। না দিলেই গণ্ডোগোল। আইনে না থাকলে কোথা থেকে দেব এটা ওদে মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। এত সব অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে সেই বামফ্রণ্টের বাঁকুড়া জেলাকমিটির চেয়ারম্যান অশ্বিনী রাজের কাছে এর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে, উনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। বোধহয় সেই মুহূর্তে আগামী নির্বাচন নিয়ে খুব ব্যস্ত বা চিন্তিত ছিলেন। পরিবর্তে উত্তর দিলেন অন্যতম নেতামনোরঞ্জন বসু। তিনি বললেন, এইসব অভিযোগ ডাহা মিথ্যে। যদি চাল বাগম দি তাহলে কত লোককে দিতে পারো? বড় জোর একশো কিংবা দুশো। আর বাদ বাকি দের কি বিরোধী করব? ওঁনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁকুড়া হিন্দুস্কুল মাঠে বিমান বসুর মিটিং-এ লোক আনতে নাকি ২ টাকা ও ৫ কেজি গম ও চাল দেওয়া হয়েছিল? মনোরঞ্জনববু বললেন, কোথা থেকে এসব শোনেন? জানি, কংগ্রেসীরা এসব প্রচার করছেন। তবে জেনে রাখুন, আমাদের টাকা দিয়ে লোক আনতে হয় না কিন্তু ইন্দিরার মৃত্যুতে মাথা নেড়া করাতে টাকা দিয়েও কংগ্রেসীরা লোক পায়নি।

জেলা সি পি এম নেতৃবর্গের মতে, আসন্ন নির্বাচনে এস ইউ সি কোন ফ্যাকটারই নয়। যতটুকু লড়াই হবার হবে কংগ্রেসের সঙ্গেই। গোটা বাঁকুড়া শহরে এস ইউ সি-র কোন অফিস দেখেছেন? বাইরে থেকে লোক এনে ওয়ালিং করাতে হচ্ছে। আর বাম ভোট কাটার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওদেরকে আমরা বামপন্থী দল বলে মনেই করি না। ওরা সব সময় বামপন্থী আন্দোলনে বাগরা দিয়ে এসেছে। আসলে ওটা কংগ্রেসের দ্বিতীয় পার্টি। ওনারা আরো জানালেন, বহু এস ইউ সি কর্মী নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সি পি এম-এ যোগ দিয়েছে। তবে পুরুলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এস ইউ সি-র প্রভাব আছে বলে এই নেতৃবৃন্দ স্বীকার করলেন।

এদের অভিমত, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে উসকানি দিচ্ছে। কংগ্রেসের মদত পেয়েই এইসব শক্তি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ বললেন, উত্তরখণ্ড আন্দোলনে ওরা মদত জুগিয়েছে। এখানে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেও আঁতাত গড়েছে। এই 'ঘৃণ্য' আঁতাতের মুখোশ জনসমক্ষে তুলে ধরতে সি পি এম নেতা মন্ত্রী অচিন্ত্য রায় বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছেন বলেও জানা গেল।

শরিকী ঐক্য এবং টেনশন

সি পি এম নেতাদের অভিমত, এবারের নির্বাচনে বামফ্রণ্টের সমস্ত শরিক এমন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন যা আগে

কখনো ঘটেনি। স্বভাবতই আসন্ন নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রেই আরো বেশি ভোটে জেতার আশা রাখেন। কিন্তু শহরের রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মেঠোপথে পা বাড়ালেই এই শরিকি ঐক্যের কিছু কিছু নমুনা চোখে পড়ে। শালতোড়া ও ছাতনায় সি পি এম এবং আর এস পি-র মধ্যে এবং ওন্দায় সি পি এম এবং ফ ব-এর ভিতরকার কলহ নিয়ে বেশ খোলাখুলি আলোচনা শোনা যায় ছোট ছোট আড্ডায় বা চায়ের দোকানের বেঞ্চে। কিছুকাল পূর্বে এই শরিকি গণ্ডোগোল খুনোখুনির আকার নেয়। এই কলহের শিকার হন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকির গোস্বামী। তাঁর ছেলে আরএস পি-র প্রাক্তন গ্রাম প্রধান। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইনি ফ্রণ্টের টিকিট পান নি। ফলে ফ্রণ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারে নামেন। ছেলের দোষে প্রাণ গেল বৃদ্ধ পিতার। ঘর থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে প্রকাশ্য দিবালোকে দা দিয়ে কেটে খুন করা হল তাঁকে। এই ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় বাঁকুড়া জেলা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হলেও গত কয়েক বছরে এখানে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হানাহানি হয়ে গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেল। কালজুরি গ্রামে একদিনে একই সঙ্গে খুন করা হল দুই কর্মী বাদল চৌধুরী ও বালজি চৌধুরীকে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দল সি পি এম কর্মীর জেলাআদালতে সাজাও হয়। কিন্তু ওরা হাইকোর্টের রায়ে ছাড়া পেয়েছে। স্থানীয় মানুষের আশঙ্কা ভোটের সময় এই অঞ্চলে বড় ধরণের গণ্ডোগোল হতে পারে। অনেকের অভিমত, এই গ্রামে ভোটকেন্দ্র করা উচিত কাজ হয় নি। কংগ্রেস বিধায়ক কাশীবাবু অভিযোগ করলেন, বামফ্রণ্টের সাত বছরের রাজত্বকালে কংগ্রেসের ৫০ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশোর উর্দ্ধে।

নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকলেও গ্রামাঞ্চলে কিন্তু নির্বাচনী উত্তাপ তেমন নেই। বরং জনমানসে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মড়ার গ্রামে জনৈক বিধবার তিন বিঘা জমিতে বর্গা অপারেশন করাহয়েছে। ঐ বিধবার এখন দিন চলে ভিক্ষে করে। বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের প্রার্থী গৌর লোহারের মতে, 'রুরাল ডেভালপমেন্ট প্রোগ্রাম' অনুযায়ী প্রতি বছর ৬০০ পরিবারকে দরিদ্র সীমার ওপর তোলার কথা। হিসাব মতো ১৯৯০-এ শহরাঞ্চলে ৪৫০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ৩৫০০ পরিবার দরিদ্র সীমার ওপর আসবেন। এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই স্কীমে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তার আরো অভিযোগ, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজের বদলে টাকা দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত কাজ এগুচ্ছে না বা করানো হচ্ছে না। তিনি বললেন, কাজ যদি হত তাহলে পথঘাটের এই চেহারা হত না বা জলের অভাবে চাষবাসও বন্ধ হয়ে থাকত না। এছাড়াও বন্যাও খরার রিলিফ বণ্টনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দলবাজীর অভিযোগ করলেন তিনি। গৌরবাবুর মতে, এই জেলায় শিক্ষা সম্প্রসারণেরজন্য বামফ্রণ্ট কিছুই করেনি।

সরকারি টাকায় বাগড়িয়ায় তিনি একটি জুনিয়ার হাইস্কুল খুলেছিলেন বটে কিন্তু বর্তমানে তার নাভিশ্বাস উঠেছে। এই স্কুলে বিনা বেতনে গরীব আদিবাসী ও তফসীল সম্প্রদায়ের ছেলেদের পড়াও থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের লোকেরা লোভ দেখালো যে কাজ করলে চাল, গম, টাকা পাওয়া যাবে। ব্যাস, অমনি স্কুল শুনশান। ফলে যাদের একমাস কাজ হত তারা কাজ করছে বড় জোর পাঁচ দিন। তারমতে, বিষ্ণুপুরে শিক্ষিতের হার শতকরা দশ থেকে বারো ভাগ।

বিষ্ণুপুরে কংগ্রেস প্রচার চালাচ্ছে এক নতুন কৌশলে। বুথ কমিটি গঠন করে প্রতিটি বুথে পৃথক পৃথক প্রচার চালাচ্ছে। এর কারণ দিতে গিয়ে কংগ্রেসের প্রবীণ ও প্রধান নেতা রামবিলাস চক্রবর্তী বললেন, সি পি এম ভোটার লিস্টে বহু জাল ভোটার ঢুকিয়েছে। স্বভাবতই প্রতি বুথে ওরা গড়ে ৫০ ভোটে এগিয়ে। তাই আমাদের এই অভিনব পন্থা নিতে হল। তাছাড়া ওদের পুরোনো অস্ত্র বুথ দখলের আশঙ্কা তো আছেই। তার মতে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমরা বিষ্ণুপুরে জেতার আশা রাখি। তবে বাঁকুড়া সিটে আমরা কিছুটা পেছিয়ে। ওখানে আমাদের প্রার্থী 'পলিটিক্যালি ফেমাস'।

বাঁকুড়ার সমস্যা

বাঁকুড়া কেন্দ্রে কংগ্রেস ও সি পি এম কতগুলো বিষয়ে একমত। উভয়েই মনে করে, বাঁকুড়ায় মজুত কয়লা একশো বছরের ওপর চলবে। তাপ বিদ্যুৎ গড়ে তোলার সমস্ত রকম সম্ভাবনা এখানে আছে। বাঁকুড়া রাণীগঞ্জ রেললাইন হলে এই সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হবে। কিন্তু রূপায়নের কাজ এখনো শুরু হল না কেন, এ সম্পর্কে দু-দলের মত পরস্পর বিরোধী। শশীবাবু বললেন, ৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে গঙ্গাজল ঘাঁটিতে ৬৩০ মে জি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি অনুমতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। বরকত সাহেবের চেষ্টায় এবং প্রণববাবুর সহায়তায় এই প্রকল্প অনুমোদন পায়। কাজ করবে ডি ভি সি। কালিদাসপুর প্রকল্প অধিগ্রহণ হয় ৮০-তে। ৮২-তে কাজ শুরু। কিন্তু বারংবার সি পি এম-এর ঘেরাও-এর ফলে রাসতাঘাট ও হাসপাতাল তৈরির কাজ ব্যাহত হয়। এবছর আবার অনুমোদন করিয়ে এনেছেন বলে তিনি দাবি করলেন। তার অভিযোগ, বাঁকুড়ার দুটি বিড়ি কারখানা ২২২ কো: এবং ৫২২ কো: লুপ্ত হওয়ার নেপথ্যে সি পি এম-এর হাত আছে। এর ফলে ২৪০০ কর্মী বেকার হয়ে পড়ে। তিনি নিজস্ব উদ্যোগ নিয়ে কারখানার বাইরে বেআইনিভাবে এইসব শ্রমিকদের বিড়ি তৈরির সুযোগ করে দিয়েছেন বলে জানালেন। বাঁকুড়ার অন্যতম ক্ষুদ্র শিল্প বিড়ি কারখানা বন্ধের কারণ সম্বন্ধে সি পি এম নেতাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বিড়ির ওপর করই-এর জন্য দায়ী। এই নতুন করের ফয়দা তুলছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা। সেজন্যই কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বিড়ি সমস্যা তো সর্বভারতীয় ব্যাপার। এখানে আমাদের কি করার আছে? তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ রেললাইনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের এম পি-রা বহুবার লোকসভায় বলেছেন। আমরাও বরকত সাহেবও প্রণববাবুর কাছে এই মর্মে পৃথক পৃথক স্মারকলিপি দিয়েছি। সীমিত ক্ষমতায় এর বেশি কি সম্ভব?"

যদি কোন অচেনা ব্যক্তি এ মুহূর্তে বাঁকুড়া যান তাহলে তিনি নির্দ্বিধায় বলবেন যে আসন্ন নির্বাচনে সি পি এম-এর জয় অবশ্যম্ভাবী। দেওয়াল লিখন, নির্বাচনী প্রচার, লাল পতাকাবাহী গাড়ির সংখ্যা সব দিক থেকেই বামফ্রন্ট তার প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের থেকে অনেকটা এগিয়ে। তবে দু'দলের নির্বাচনী সভাগুলোতে বেশ ভীড় হচ্ছে। বিশেষত, শীতের সন্ধাতে গ্রামাঞ্চলের সভাগুলোর ভিড় রাজনৈতিক মহলকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ, এমন নজীর অতীতে খুব কমই পাওয়া যায়। এছাড়া কংগ্রেসের সভাগুলোতে যুবকদের ভীড় তুলনামূলক ভাবে বেশি। এদের অনেকের এখনো ভোটাধিকার হয়নি। এবিষয়ে উল্লেখ্য বিষ্ণুপুর রামনন্দ কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে মোট ৩৯টি আসনের সবকটি দখল করে ছাত্র পরিষদ।

নির্বাচনী যুদ্ধের ঢাকে কাঠি পড়লেও নির্বাচনী হাওয়া এখনও তেমন বইছে না। অতএব হাওয়া দেখে ফলাফল আঁচ করা এবার বেশি কঠিন। বিষ্ণুপুরের জনৈক প্রবীণ স্কুল শিক্ষক বললেন, এখন সমীক্ষা করে কি লাভ, যে যেখানে ছাপ মারবে আগেভাগেই সব ঠিক করে রেখেছে, সময় হলেই টের পাবে'খন। □

কলকাতার তিনটি আসন কার কব্জায়

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার তিনটি আসনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে ইতিমধ্যেই নানারকম জল্পনা শুরু হয়ে গেছে। প্রায় সবারই উৎসুক জিজ্ঞাসা এবারও কি কলকাতায় আশি সালের সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি হবে! নাকি চিত্রটা বদলে যাবে আমূল। পশ্চিমবঙ্গে ভোটযুদ্ধের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস কর্মীরা অবশ্য নিজেদের দলীয় প্রার্থীদের জয় নিয়ে কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করতেই অনিচ্ছুক। একদিকে বামফ্রন্ট কর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস গত বারের মত এবারেও কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্ট প্রার্থীদেরই জয় সুনিশ্চিত। অন্যদিকে কংগ্রেস কর্মীদের আত্মপ্রত্যয়ী ঘোষণা—কলকাতায় তিনটি আসনই এবার তাদের কব্জায়।

সমীর মিত্র

আশি সালে লোকসভা অথবা বিরাশি সালে অনুষ্ঠিত বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কলকাতার আসনগুলির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে এই জাতীয় জল্পনা খুব একটা উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিগত এই দুটি সাধারণ নির্বাচনেই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়লাভ নিয়ে কমবেশি সবাই নিশ্চিত ছিল—এমন কি আশি সালে লোকসভার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেনের জয়লাভ সত্ত্বেও বিরাশির বিধানসভা নির্বাচনে এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বিধানসভার সবকটি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভ নিয়ে সুনিশ্চিতভাবে কেউই কোন মন্তব্য করতে সাহস পায়নি। কিন্তু বিরাশির বিধানসভা নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে বামফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধি হলেও কলকাতায় কংগ্রেসের তুলনামূলকভাবে আশাপ্রদ ফলাফল ও মহানগরীর মোট বাইশটি আসনের মধ্যে এগারটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয়লাভ সাংবাদিক, রাজনৈতিক ভাষ্যকার থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষকেই নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে বাধ্য করায়। এমন কি বিগত নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের এই আশানুরূপ সাফল্যে উৎফুল্ল দিল্লি থেকে প্রকাশিত কংগ্রেসী পত্রিকা ন্যাশনাল হেরল্ড মন্তব্য করতে দ্বিধা করে না, "হোয়াট ক্যালকাটা থিংকস্ টুডে, বেঙ্গল থিংকস্ টু মরো"। বিরাশির নির্বাচনে এগারটি আসনলাভে কলকাতায় নিজেদের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কংগ্রেসী মহলে যে সন্তুষ্টির সূচনা হয়েছিল তা আরও জোরালো হয়ে ওঠে এ বছর পূর্ব বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সি. পি. এম. প্রার্থী লক্ষ্মী সেনের পরাজয়ে।

বিরাশির নির্বাচনে কলকাতার অর্ধেক কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পরাজয়ের পর থেকেই এর সম্ভাব্য কার্যকারণ উদ্ঘাটনের জন্য নানারকম বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে মোটামুটি এইরকম একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় মহানগরীর কয়েকটি প্রধান সমস্যা

মোকাবিলায় বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার দরুনই তাদের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এই জাতীয় সিদ্ধান্তকে সঠিক ধরে নিলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার তিনটি কেন্দ্রেই কংগ্রেসের সাফল্য নিয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ, কলকাতার রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যানবাহন, বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ হাসপাতাল প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলায় গত আড়াই বছরে বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্যের নজির রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু, ক্ষেত্র বিশেষে এই সব সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে।

তবে এই জাতীয় সরলীকরণ থেকে কলকাতার বর্তমান রাজনৈতিক চিত্র অনুমান করার প্রচেষ্টা বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য। এমন কি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার আসনগুলির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়েও কোনরকম অনুমান সম্ভব নয়। কেননা মহানগরীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বামফ্রন্টের ব্যর্থতার তালিকা দীর্ঘ হলেও বিগত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের - '৭৭সালের বিধানসভা, '৮০সালের লোকসভা ও '৮২ সালের বিধানসভা-পরিসংখ্যান থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হয় যে এই সময়ের মধ্যে কলকাতায় বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা অনেক কেন্দ্রেই তাদের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৭-এর বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট যেখানে কলকাতার ২২টি কেন্দ্রে মোট ৪৪০৫৭৪টি (৪০.৮৬ শতাংশ) ভোট জোটাতে সক্ষম হয়েছিল, ১৯৮২-র বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে বামফ্রন্টের সমর্থনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮৮৮৮২ (৪৯.৬৪ শতাংশ) তে পৌঁছয়। অবশ্য এই দুই নির্বাচনে ফলাফলের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে কংগ্রেস দলের পক্ষে ১৯৭৭ সালে যে সংখ্যক (২৫৬১৮৯, ২৩.৭৬ শতাংশ) ভোট পড়েছিল ১৯৮২ সালে তা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (৬২৮৩৫৯, ৪৫.২৭ শতাংশ)।

অবশ্যই ১৯৭৭ সালের নির্বাচনী ফলাফলকে ভিত্তি করে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরকম সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ সেই সময়ে সমগ্র উত্তর ভারতের মত পশ্চিমবঙ্গেও ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া ছিল প্রবল। এছাড়া রাজ্যের অ-বাম ভোটও সেদিন কংগ্রেস ও জনতা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। যার ফলে '৭৭-এর নির্বাচনে কলকাতার চারটি আসন চলে যায় জনতা প্রার্থীদের দখলে। বরং এক্ষেত্রে ১৯৮০

সালের লোকসভা ও ১৯৮২ সালের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বর্তমানে রাজ্যের দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও বামদলগুলির রাজনৈতিক শক্তি ও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে অনুমান করা অনেক বেশি যুক্তিসংগত হবে। কারণ ১৯৮০ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই একদিকে যেমন ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া অন্তর্হিত হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে রাজ্যের সমস্ত অ-বাম ভোটকে নিজেদের শিবিরে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। যদিও রাজ্য বিধানসভায় জনতাকে তখনও পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী দল হিসেবে গণ্য করা হত।

১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান বিচার করলে ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য শক্তিবৃদ্ধি প্রথমেই নজরে পড়ে। ১৯৭৭-এ তারা যেখানে মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২৩.৭৬ শতাংশ পেয়েছিল। ১৯৮০-তে তা বেড়ে যায় ৪২.১৩ শতাংশে। আগেই এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তুলনায় বামফ্রন্টের অগ্রগতি এই সময়ে অনেক শ্লথ। ৪০.৬৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ৪৩.১৩ শতাংশ পৌঁছয়। '৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার ২২ টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৫৩৬৬৬৮টি

ভোট পেয়ে বামফ্রন্ট উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়। অপর দিকে কংগ্রেস ৫২৪২২৯টি ভোটের ভিত্তিতে শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রটিতে জয়লাভ করে।

অন্যদিকে ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভোট পূর্ববর্তী নির্বাচনে ৪৩.১৩ শতাংশ থেকে ৪৯.৬৪ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। তুলনায় কংগ্রেসের অগ্রগতি এই সময়ে ধীর। ১৯৮০ সালের ৪২.১৩ শতাংশ থেকে ৪৫.২৭ শতাংশে পৌঁছয়। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস যথাক্রমে মোট ৬৮৮৪৪২ ও ৬২৮৩৫৯ টি ভোট পেয়ে কলকাতার বাইশটি আসনের মধ্যে ১১টি করে নিজেদের দখলে আনে। এর মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয় কাশিপুর, শ্যামপুকুর, বড়তলা, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, বৌবাজার, চৌরঙ্গী, আলিপুর, রাসবিহারী ও শিয়ালদহ কেন্দ্রে।

উল্লেখ্য যে ১৯৮০ সালের লোকসভা

নির্বাচনের ঠিক এই এগারটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতেই কংগ্রেস প্রার্থীরা বামফ্রন্ট প্রার্থীদের চাইতে অধিক সংখ্যক ভোট আদায়ে সমর্থ হয়েছিল। বরং লক্ষ্য করার বিষয় যে ১৯৮২ সালের নির্বাচনে এইসব কেন্দ্রের অধিকাংশতেই বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোটের ব্যবধান তুলনামূলকভাবে অনেক কমে এসেছে। শুধুমাত্র বড়তলা ও শিয়ালদহ কেন্দ্রেই কংগ্রেস প্রার্থীরা এই ব্যাবধান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে এবং আলিপুর ও রাসবিহারী কেন্দ্রের ব্যবধান মোটামুটি একই রকম রয়েছে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বাকি এগারটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি বাদে সবকটিতেই বহুলাংশে এই ব্যাবধান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ১১টি আসন জয়লাভে বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে এরকম অনুমানের

ভিত্তিতে যে কোন সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত দুটি সাধারণ নির্বাচনে কলকাতায় প্রদত্ত ভোটের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আশি সালের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষত, কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের অধিকাংশই যেখানে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। তবে মনে রাখা দরকার আশি ও বিরাশি সালের ভোটিং প্যাটার্নে সাযুয্য ছিল বলেই এবারেও তার পুনরাবৃত্তি হবে এরকম ধারণার ভিত্তিতে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আদৌ যুক্তিসংগত নাও হতে পারে। □

বিধানসভা নির্বাচন □ বোলপুর

ক্ষুধাই একমাত্র হাতিয়ার

নিরন্ন এবং সম্পন্ন মানুষেরা আবার একই সারিতে এসে দাঁড়াবেন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। এই চমকপ্রদ ঘটনাটি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এ দেশের অভ্যন্তরে তৈরি করে এক ভিন্নতর মেজাজ। কিছুদিনের জন্য দেয়ালগুলো চলে যায় সাফল্য ও দুর্দশার বিবরণের কব্জায়। ভোটদানের একটি অমোঘ গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করে নাকি ভোটদাতাগণ পেতে পারেন কল্পনার স্বর্গরাজ্য বা অনন্ত নরক—এ রকম এক রূপকথার গল্প প্রচারিত হয় মঞ্চ থেকে।

বীরভূম জেলার বোলপুরে এবার লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিধান সভা নির্বাচন। বোলপুর বিধান সভা কেন্দ্রের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি জ্যোৎস্না বাবুর আকস্মিক মৃত্যুই এর কারণ। ফলে মুখোমুখি হচ্ছেন এক প্রিয়দর্শী যুবক এবং একজন স্কুল শিক্ষক। এই দুই প্রার্থী শুধু রাজনীতির দিক থেকে দুই বিপরীত মেরুর বসিন্দা নন, ভৌগলিক ও সামাজিক ভাবেও তাই। কংগ্রেস (ই) প্রার্থী সুশোভন বানার্জী হলেন বিদেশ ফেরত একজন সফল ডাক্তার। বামফ্রন্টের গোলাম মর্তুজা মাধ্যমিক স্কুলের, শিক্ষক, যাঁর শরীর থেকে চাষবাসের দাগ এখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। আর এঁদের দুজনের মধ্যেই রয়েছে একটি আভ্যন্তরীন সাদৃশ্য, গ্রামাঞ্চলে সি.পি.এম রাজত্বে যে ইস্কুল মাস্টারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মর্তুজা গ্রামের সেই স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। আর সুশোভন বোলপুর শহরের একজন সচ্ছল পেশাদার ব্যক্তি।

আদিবাসী, হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও এ অঞ্চলের ভোটারদের মধ্যে আছেন বিহার, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আগত বেশ কিছু মানুষ। বিশেষ করে বিহার থেকে আগত মানুষজনের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি। বিয়ের কণে হিসাবে বিহার থেকে তারা যত সংখ্যায় এসেছেন, এখান

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

থেকে বিহারে কনে হিসাবে গিয়েছে তার তুলনায় অনেক কম সংখ্যায়। এই প্রতিবেদন শুরু হতে পারত দলীয় কর্মীদের সাক্ষাৎকার, দেওয়ালের লিখন বা সভা-সমিতি কেন্দ্রিক ভোট হাওয়াকে ঘিরে। আমার মনে হয়েছে সংগঠিত ও অসংগঠিত সমস্ত প্রচার মাধ্যমই যাকে বলা হয় 'জনমত ম্যানুফ্যাকচার করা'—তাই করে থাকে। ফলতঃ এই পথটি কাজ শুরু করার পদ্ধতি হিসাবে বাতিল করে দিই। এরপর থাকে সরাসরি মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা। এ রকম দাবী করা মিথ্যে এবং অন্যায় হবে যে সরাসরি সংখ্যা গরিষ্ঠের সঙ্গে আমি যোগাযোগ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি।

তবে, অনুমান, জ্যোতিষিগিরি ও নিজস্ব রাজনৈতিক ঝোঁক যতদূর সম্ভব এড়িয়ে বোলপুর শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় গিয়েছি। চেষ্টা করেছি কথা বলতে এলাকার সমাজ সংগঠনের ওপর ও নীচের তলার কিছু মানুষের সঙ্গে। বোলপুরে সেবামূলক কাজ করে থাকেন এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান (যারা নিজেদের অ-রাজনৈতিক বলে দাবী করেন) বনেদী বাসিন্দা, প্রফেসন্যাল লোকজন, সরকারী বেসরকারি কয়েকটি অফিস ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেছি। এক কথায় যেখানেই সংখ্যা গরিষ্ঠের পায়ের ছাপ পড়ে সেসব জায়গায় একবার করে ঢুঁ মেরেছি।

লালমাটির এই দগদগে এলাকায় বাঙালির গর্ব ও আত্মপ্রসাদের একটি স্মৃতি স্তম্ভ আছে সকলেই জানেন। ঐ স্মৃতি স্তম্ভটি আমাদের পর্যটনের অর্ন্তভুক্ত নয় এখন। তবে সমস্যায় জর্জরিত, মিশ্র ও খিচুড়ি অর্থনীতির এলাকাতে ঐ দ্বীপ-টি যতই অদ্ভুত ও বেখাপ্পা লাগুক না কেন সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের বিচারে, ওখানেও ভোটাররা থাকেন, আছেন। অন্য দিকে, নিরীহ শান্তিনিকেতন বোলপুর বিধানসভা নির্বাচনে কোন ভূমিকাই নেবে না (প্রতিষ্ঠান হিসাবে) একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বরং আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছেছি সেদিনই শান্তি নিকেতন থেকে গবেষক শিক্ষকদের একটি দল নিকটবর্তী গ্রামে জিপে চড়ে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য পরিবেশ সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া, ঐ গ্রামে কিছু কার্যকরী কর্মসূচী নেওয়া। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে একটি গ্রান্টপ্রায় মঞ্জুর।

বীরভূম গেজেটিয়ার্স (১৯৭৫) ঘাঁটলে দেখা যায় বীরভূম জেলায় বনভূমির পরিমাণ ছিল ১৩৭ বর্গ কি.মি.। এমনিতেই তা ছিল সামগ্রিক এলাকার মাত্র ৩ শতাংশ। জাতীয় বণনীতি অনুসারে যা হওয়া উচিত ছিল মোট এলাকার ২০ শতাংশ। বর্তমানে সমগ্র বোলপুর এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজলেও

লাক্ষা শিল্পে নিযুক্ত একজন মানুষও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এই ঘটনাটি খুবই প্রতীকি, লাক্ষা চাষের সঙ্গে বনের সম্পর্ক ওতোপ্রোত।

বিনোরিয়া গ্রামটিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা দু-একটি গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের জন্ম দিয়েছে। তবে গোরুর সংখ্যা কম হওয়ায় প্ল্যান্টের উৎপাদন যথেষ্ট নয়। আবার গরু বেশি রাখলে গাছ থাকে না। সম্প্রতি এমনও দু-চারটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে দরিদ্র মানুষ জ্বালানী কাঠের অভাবে মৃতদেহ দাহ করতে পারেনি। নদীর তীরে কবর দিয়েছে।

বিশ্বভারতীর নিজস্ব এলাকার মধ্যে সাঁওতালদের চারটি পাড়া বর্তমান। পিয়ার্সন পল্লী, কালীগঞ্জ, বালীপাড়া, বাগানপাড়া। উনিশ শতকের ষষ্ঠদশক থেকে সাঁওতালরা এই এলাকায় আছেন। সম্ভবত এদের আগমন ঘটে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর। ব্রিটিশের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতেই বিহারের ছোটনাগপুর এলাকা থেকে এঁরা এখানে পালিয়ে এসেছিলেন। এবং এইসব পরিবারের অধিকাংশই এখানে আছেন পাঁচ পুরুষের বেশি সময় ধরে।

চারটি পাড়ায় সর্বসাকুল্যে এখনও টিঁকে আছেন মোট ১৯৬৫ জন মানুষ। ১৯৮১ সালে বিশ্বভারতী এঁদের মধ্য থেকে ১৯৭ টি পরিবারকে বেছে নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় এদের সামাজিক-অর্থনৈতিক যে অবস্থার কথা জানা যায় তা এইরকম :

ভূমিহীন কৃষক–১২৭ টি পরিবার, প্রান্তিক চাষী–৩০টি পরিবার, মাঝারি কৃষক–১৪ টি পরিবার। মাত্র ২-টি পরিবারকে কোনক্রমে সম্পন্ন কৃষক বলা যায়। ৬০ বছর বয়ঃসীমায় স্বাক্ষরের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি এবং যতই তলার দিকে নামা গিয়েছে স্বাক্ষরের হার তত দ্রুত কমেছে। ৯ বছর বয়সের নীচে ৫টি সাঁওতাল শিশু দিনমজুরের কাজ করেছে, ১৪–১৭ বয়ঃসীমা মধ্যে যেসব শিশু পুরোপুরি দিনমজুর হয়ে গিয়েছে তাদের শতকরা হিসেব ২২.১৪।

মোট পরিবারের ১০% বছরে মাথা পিছু আয় করে ১ টাকা

৫০% মাথাপিছু আয় করে ২ টাকা

১৪% মাথাপিছু আয় করে ৪ টাকা

সমগ্র বোলপুর বিধানসভা এলাকায় যেখানে-যেখানে আদিবাসী আছে, সর্বত্র-ই এই চিত্র কম-বেশি উপস্থিত। ১৯৮১ সেন্সাস অনুযায়ী বোলপুর বিধান সভা নির্বাচনী এলাকায় আদিবাসীর সংখ্যা ২১০৮৪। মোট ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৪৯ জনের মধ্যে এখানে ভোটার তালিকায় নাম আছে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৩২৯ জনের। জনসংখ্যার ব্যাপকতম অংশ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৬৩ জনই থাকেন গ্রামাঞ্চলে এবং তপশীল জাতির অন্তর্গত হলেন ৩৬৬৬২ জন মানুষ। ফলে নির্বাচনী আবহাওয়া-মোরগের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করছে এই পশ্চাদপদ, অনগ্রসর গ্রাম ও তার মানুষজনের ওপর।

ভোটের আবহাওয়া-মোরগ কি বলেছে

এই প্রতিবেদনের একেবারে শুরুতে বিনোরিয়া গ্রামের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে পরিবেশ আন্দোলন ও গোবর-গ্যাস প্ল্যান্টের কথা। বামফ্রন্টের কর্তা ব্যক্তিদের একজন, বোলপুর সি.পি.এমের এল.সি.এস জানালেন 'হ্যাঁ কেবলমাত্র পাইয়ে দিয়ে যে পকেটে ভোট পোরা যাবে না আমরা জানি, কিছু লোক হয়ত কিছু পাচ্ছে কিন্তু অধিকাংশই থেকে যাচ্ছে বঞ্চিত। এই বঞ্চিত এবং কিছুটা-পাওয়া মানুষজনের মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করা গেছে, এই জায়গাটাই আমাদের সাফল্যের উৎস'।

প্রকারান্তরে, সরকারী মেশিনারি-বিশেষজ্ঞ-পঞ্চায়েত মিলিয়ে বামফ্রন্ট গড়ে তুলেছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি ইলেকশন মেশিনারি। যদিও গ্রামের নিরন্ন ও কর্মহীন মানুষের কাছে তারা বক্তব্য হিসাবে যা রাখতে পারছেন তা খুবই বিমূর্ত কতগুলো ধারণা। অতীতে কমিউনিস্ট নেতাদের টি.বি. হোত, বস্তিতে থাকতে হোত, বা নিজের সন্তানের শিক্ষার জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল পাড়ার স্কুল।

–পাঠক জানেন বামপন্থী নেতারা এখন আর সে অবস্থাতে নেই। কিন্তু একটি মিল থেকে গেছে তা হল ঐ বিমূর্ত রাজনীতি। আসলে কংগ্রেস-সি.পি.এম সকলেরই রাজনীতি যে কেন্দ্র বিন্দুটি ঘিরে আবর্তিত তার নাম ক্ষুধা।

'ইন্দিরা ফ্যাক্টর' বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জোরালো কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না, যেমন পারবে না কেন্দ্র-রাজ্য বিতর্ক বস্তুতঃ দলের সাংগঠনিক শক্তি এবং যে-দুজন প্রার্থী এই এলাকায় প্রধান-প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সাধারণের কাছে গ্রাহ্য, সেই দুজনের ব্যক্তিত্ব ও ব্যাকগ্রাউন্ড, এই দুটি জিনিসই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করবে। তৃতীয় যে উপাদানটি থাকতে পারত, অর্থাৎ লোকাল ইসু, সে জিনিসটা সুশোভন বাবু বা গোলাম মর্তুজা কারো পক্ষেই ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন অর্থেই তেমনভাবে উপস্থিত নয়।

গ্রামাঞ্চলে এন.আর.ই.পি কর্মসূচি সাধারণভাবে অতীতের ফুড ফর ওয়ার্কের সমতুল্য। বোলপুরের গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের

কর্মসূচী যখন-যেমন নেওয়া হয়েছে সি.পি.এম. তার অব্যবহিত পরেই ঐসব গ্রামাঞ্চলে সভা-সমিতি আলোচনা চালিয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন যুদ্ধ মাথায় রেখে সি.পি.এম তার কাজ চালিয়ে গিয়েছে ছেদহীন ভাবে। কংগ্রেস প্রার্থী সুশোভন ব্যানার্জী নিজেই স্বীকার করলেন 'একটা মারাত্মক ভুল চলে আসছে অনেক দিন থেকে, গরীব-বড়লোকের মধ্যে বাছাবাছির প্রশ্নে। পুরনো কংগ্রেস জামানায় সন্দেহ নেই বড়লোকদের দিকটা-ই টেনে চলা হত। অবশ্য আমি মনে করি সি.পি.এমের নামে গরিবের দল সাজাটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম।'

সিয়ান-সিঙ্গি-সাত্তোর অঞ্চল ঘুরে অবশ্য এই প্রতিবেদকের মনে হয় নি যে সি.পি.এমের, ঐ মেক-আপ গ্রামাঞ্চলের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কসবা, রামপুর-সুপুর, কঙ্কালী, বাহিরি পাঁশোয়া, সিঙ্গি সংসদ, আলবাঁধা সর্পলেহনা, সাত্তোর, সিয়ান মুলুক ও বোলপুর টাউন। ১৪ টি ওয়ার্ডের এই অঞ্চলটি ঘিরে '৮৪ নির্বাচনে থাকবে ১২৯ টি বুথ। এর মধ্যে শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চল হল: রায়পুর-সুপুর, সিয়ান অঞ্চল, সাত্তোর, কসবা, কঙ্কালীতলা, আলবাঁধা, রূপপুর, সিঙ্গি ও বাহিরি। গোটা অঞ্চলটির ভোটের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। মোট ভোটের অর্ধেকের কিছু কম। অর্থাৎ বাইরে থেকে যায় ৫৩-৫৪ হাজার ভোট। সুতরাং বোলপুর বিধানসভা নির্বাচনে এবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ফাইন্যাল খেলার সঙ্গেই তুলনীয়। অন্ততঃ ভোটের আবহাওয়া মোরগ তাই বলছে।

মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায় নি। বরং বলব 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ' গোছের একটি মনোভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। সিঙ্গি-তে সি.পি.এমের একজন একনিষ্ঠ কর্মী মাণিক শেখ এই নির্বাচনে কোন কাজ করছেন না। শুধু তাই নয় তিনি সি.পি.এম. বিরোধী কথাবার্তা খোলাখুলি বলছেন। সাত্তোরে আর.এস.পি-র পঞ্চায়েত সদস্য মুস্তাফা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

বোলপুর শহর থেকে দূরতম গ্রামগুলিতে কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের পদচিহ্ন ভোটের আগে কম পড়েছে। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীদের বেশিরভাগ-ই থাকেন বোলপুর শহর ও তার লাগোয়া অঞ্চলে। বলাবাহুল্য বোলপুর ও তার কাছাকাছি গ্রামগুলিতে বামফ্রন্ট প্রার্থী গোলাম মর্তুজা ডাঃ ব্যানার্জীর থেকে অনেক কম ভোট পাবেন। তবে এথেকে নির্বাচনী হাওয়ার গতিমুখ বোঝা বেশ কঠিন।

বোলপুর বিধানসভা এলাকা ৯-টি

উন্নয়ণ আকাশ পথে

বোলপুরে এককালে ১৯টি রাইস মিল ছিল এখন তার সংখ্যা কার্যতঃ ৭-৮ । যদিও তার অর্থ এই নয় যে বোলপুর এগোচ্ছে না। মালদা যেমন গণির গভীর মনোযোগ, ভালোবাসা পেয়ে আসছে, ঠিক একইভাবে আরেকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর উদ্যম, যোগাযোগ ও ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন বোলপুরের সমৃদ্ধির জন্য।

একটা ছোট হিসাব দেওয়া যাক, গত কয়েক বছরে বোলপুরে (শহরাঞ্চলে) বাসস্থান সমস্যা তীব্র হয়েছে। প্রায় বম্বে শহরের মত এখানেও ঘর পাওয়ার আবশ্যিক শর্ত 'পাগরি' তথা সেলামি। তদুপরি ভাড়া ও বেড়েছে কমপক্ষে ৬-৭ গুণ। ওপর থেকে যে উন্নয়ণ এখানে 'চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে' এ তার-ই ফলশ্রুতি বলে একটি মহল মনে করে। অপর মহলের মত এতে করে বহু কর্মসংস্থান ঘটেছে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল একসাইজ, এল.আই.সি., কাস্টমস, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স, সেন্ট্রাল মিল্ক বোর্ড, টি.ভি. রীলে সেন্টার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক.... ইত্যাদি, ইত্যাদি হল অফিস কাছারি আশ্রিত এই উন্নয়নের আংশিক নমুনা।

নির্বাচনী প্রচারে উভয় পক্ষেই উন্নয়ন একটা জোরালো ইসু। বামফ্রন্টের প্রচারের বর্শামুখ হল উন্নয়ন আসবে গ্রাস-রুট-লেভেল-পথে, তবেই তা হবে প্রকৃত উন্নয়ন। গ্রামের নির্বাচনী সভায় সাধারণ কৃষক ও ক্ষেতমজুর ঐসব কথা বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে যাচ্ছে। আর সর্বত্র-ই তাদের মধ্যে যে বোধটা দানা বাঁধছে তা হল, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওরা আমাদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না। গ্রামের কয়েকজন মানুষের নাম উল্লেখ করে এই অনুভূতিটাকে প্রামান্য করে তোলার প্রয়োজন নেই। এককথায় সর্বত্র কথা বলে আমি এই জিনিসটা বেশ স্পষ্টভাবে টের পেয়েছি। 'আমরা' আর 'ওরা'র মধ্যে বিভক্ত এই বিধানসভা নির্বাচনে চাপা সন্দেহ, অসন্তোষ এবং বহু ক্ষোভ জমে আছে। এবং শুধু উন্নয়ন নয়, ডান বাম উভয়েরই (নকশালপন্থী প্রার্থী সহ) অবস্থা ঐ 'ওরা' অর্থাৎ ওপর থেকে নেমে আসা কিছু। মাঝখানে লালমাটির দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ব্যবধান।

কে জিতবেন

নির্বাচনের মুখে ভারতীয় নাগরিকগণের প্রার্থী, ভোটার ও সমর্থক অস্তিত্ব খুবই সাময়িক ব্যাপার বরং এটা ভাবাই সঙ্গত হবে যে নাগরিক হিসাবে দল ও ব্যক্তির কাছে আমরা যা প্রত্যাশা করি তার অনুপস্থিতি সত্য হলেও অমোঘ নয়। গণতান্ত্রিক চেতনা ও তার পরিমন্ডল গড়ে ওঠার প্রশ্নে জাতি হিসাবে ভারতীয়রা তেমন দীর্ঘ সময় কিছু নষ্ট করেনি। অন্যদিকে ৫২ সাল থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা এদেশের মাটিতে এতদিনে একটি ধারাবাহিকতা রচনা করেছে।

বোলপুর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে শহরও গ্রামাঞ্চলের এই ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৫৭ সালে এখান থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অমরেন্দ্র নাথ সরকার। ৫৭-৮২ এই সময় কালের মধ্যে মোট ৬ বার নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে এবং একবারও এই নির্বাচনী কেন্দ্র বিধানসভায় কোন কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রেরণ করেনি। অন্যদিকে

নকশালরা সংসদীয় রাজনীতিতে কিছু রক্তের দাগ রেখেছে, ডাঃ আর.কে. সিনহা (১৯৬৭ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) কে খুন করে। যদিও আমরা বিস্ময় বোধ করছিনা ৮৪ নির্বাচনে এখানে নকশাল প্রার্থীকে দেখে, যিনি ভোট পাবেন যৎসামান্য।

ব্যক্তি হিসাবে সুশোভনবাবু যথেষ্ট জনপ্রিয়। মাত্র এক টাকা ভিজিট নিয়ে রোগী দেখে থাকেন। সফল ডাক্তার, সুদর্শন, ডাঃ ব্যানার্জীর নির্বাচনী সভায় জন সমাবেশ মোটেই খারাপ নয়। সুশোভনবাবু বিশ্বভারতী সংসদের এবং কর্মসমিতির সদস্য হওয়ায় বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিদদের একাংশকে কাছে টানতে পেরেছেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর একটা প্রভাব পড়বে।

মর্তুজা সম্পর্কে একটা জোরদার প্রচার হল তিনি বাইরের লোক কারণ মর্তুজার বাড়ি ইলামবাজারের ঘুড়িসায়। তাছাড়া আর. এস. পি.-র সংগঠনের জোর যে তাঁকে একটি জমি দেবে সে উপায়ও নেই। যদিও গ্রামের দিকে সি.পি.এমের জোরদার সংগঠন মর্তুজাকে বেশ কিছু ভোট এনে দেবে।

সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে বোলপুর বিধানসভা নির্বাচনে শহর বনাম গ্রামের একটি লড়াই জমে উঠেছে। মুসলিম ভোট ১৯৮২ তে ছিল ১৬,২১১। হয়ত চিরাচরিত নিয়ম মেনেই এই ভোটের বেশ বড় একটা অংশ মর্তুজা টেনে নিতে পারেন। তবে এখানেও সংশয় আছে, কারণ জাতপাতের ও যৌথ পরিবারের বিন্যাসে বিভক্ত গ্রামের ভোটের লজিক বড় অদ্ভুত। কংগ্রেসের মুসলমান কর্মী গ্রামাঞ্চলে খারাপ নয়, তাঁরা বেশ কিছুটা প্রভাব রাখবেন। আর ইন্দিরা ফ্যাক্টর রচনা করবে সংখ্যালঘুদের কাছে নিরাপত্তার এক আবহাওয়া, যাতে সত্যি মিথ্যে দুই-ই আছে। পাঠক মার্জনা করবেন সত্যি আমি বলতে পারলাম না কে জিতবেন। □

খোদ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটেই কংগ্রেসের দিকে পাল্লাভারী

আলিমুদ্দিন পাড়া একদিক থেকে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই ডি.আই.পি. পাড়ায় সার্কুলার রোড দিয়ে ঢুকলেই সি পি এমের রাজ্য দফতর। আর ওয়েলেসলী দিয়ে এলে পড়ে প্রদেশ কংগ্রেস অফিস। প্রায় প্রতিদিন সাইরেন বাজিয়ে ঢোকেন জ্যোতিবাবু। কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের ভিড়ে অফিস উপচে রাস্তায় পড়ায় পাড়ার শেষ মাথায় বেশ জটলা। এদিকে সারসার নির্বাচনী জিপ দাঁড়িয়ে। ওদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মারুতি এবং বেশকিছু সরকারি গাড়ি। ক্যাডার লীডার তথা মন্ত্রী-সান্ত্রী সহ খবর কুড়োনো রিপোর্টারের ভিড়ে পাড়ার সদর খিড়কি দুই এখন সরগরম। কিন্তু অন্দর মহলে ভোটের জ্বর এখনো তেমন ওঠেনি। নির্বাচন এখানকার অধিকাংশ মানুষের কাছে অবসরে চর্চার বিষয়।

'ছিয়াসত' তথা রাজনীতির মামলায় না থাকার সাফ জবাব পাওয়ার আগে ও পরে যা জানা গেছে, তাতে বোঝা যায় কংগ্রেসের দিকেই পাল্লাভারী মধ্যবয়স্কা হোটেল মালিক কামালউদ্দিন এবং তরুণ দোকানদার এম. হোসেন দুজনেই একমত। অঘটন কিছু না ঘটলে কংগ্রেস এখানকার ভোট পাচ্ছে। তবে হোসেন জানায়। আমরা বাঙ্গালীরা কিন্তু সি পি এমকেই ভোট দেবো। উল্লেখযোগ্য তালতলা অঞ্চলের আওতায় ৬০% বসিন্দাই উর্দুভাষী মুসলিম। কম্পাউন্ডার মুস্তাফা সখেদে বললেন, সি পি এমের রাজ্য দফতর এ পাড়ায় অথচ দেখুন, এখানকার এম.এল.এ কংগ্রেসের আবদুর রউফ আনসারি। সি.পি.এমের আবুল হাসান গত বিধানসভা নির্বাচনে ৪০০০ ভোটে হেরেছিলেন। অথচ অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের তুলনায় লোকসভা নির্বাচনে অশোক সেন এই অঞ্চলে পান সবচেয়ে কম ভোট, ১৯,৪১৩ আর শ্যামসুন্দর গুপ্ত ২৪,০৯৫ তাসত্ত্বেও হাওয়া ঘুরে গেল কেন? এর কারণ সম্পর্কে পুছতাছের জবাবে আলিমুদ্দিনের ভোটাররা যা জানিয়েছেন তার মমার্থ, হাসান সাহেব ভালো মানুষ কিন্তু তিনি আমাদের জন্য কিছুই করেন নি। নোংরা, ঘিঞ্জি মহল্লাটি তাই সি পি এমের কাবাব-মে-হাড্ডি বনে রয়েছে। মুলুকের হাওয়া বা ট্র্যাডিশনালি কংগ্রেসের ভোটার এগুলো ফ্যাকটর বটে তবে এমন নয় সবাই খুব ইন্দিরা বা ইন্দিরা কংগ্রেসের ভক্ত। সব সরকারই মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য করেছে এই বোধটি এখানেই সবচেয়ে সরব। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে ভোট যাওয়ার পেছনে বাম সরকারের কাজকর্মে হতাশার ভূমিকা অনেকটাই। 'বাঙ্গাল

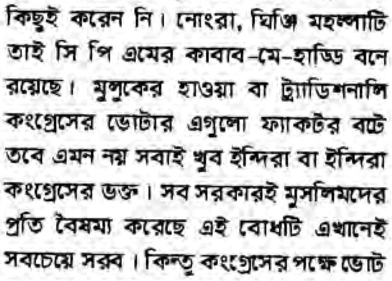

সরকার ভি মুসলিম লেড়কাদের কামকাজ দিল না।' বললেন এক কোম্পানীর দ্বারোয়ান জানে আলম। বস্তুত:পক্ষে নির্বাচনের প্রশ্নে সিনিসিজম এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি, বিড়ি বাঁধছিলেন খুরশিদ। তার সোজা কথা, 'সব সরকার পুঁজিপতিয়োসে হাত মিলাতে রহাঁ। দেখো মাহওগহে কিতনা বাড়তে যা রহা হ্যায়।' তাহলে ভোট দাও কেন? 'কিউ নেহী দেগা, ভোট কা টাইমমেই সব আকে খোসামোদি করতা হ্যায়, ঠাপ্পা দেনে কা বাদ কোই পুছেগা? তারপর আমায় হাতজোড় করে, 'আপ আভি যাও। বিশ মিনিট বাত করেগা তো পঞ্চাশ পয়সাকে কাম নেহী বনেগা। আখির মুঝে ঘর পালনা হ্যায়'।

কেন্দ্র–বৌবাজার

আবদুর রউফ আনসারি (কং-ই)-২৬,০০১

আবুল হাসান (সি পি এম)–২২,৬১৫

□ নিজস্ব প্রতিনিধি

রামকানাই গ্র্যান্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা

৮৫/ডি, উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড্

কলি–৭০০ ০৬৭

মিলের যাবতীয় ধুতি, শাড়ি ও জামার কাপড়, তাঁতের ধুতি, শাড়ি, সিল্কের নানাবিধ মনোরম শাড়ি ও গরম জামা কাপড়ের বিপুল আয়োজন।

॥ আমরা বড়বাজারের দরে বিক্রয় করিয়া থাকি॥

'রাজনীতিতে নতুন রক্ত আসুক'

জয়া বচ্চন

দীর্ঘকাল ফিল্ম-জগতে কাটিয়েও হিরোইন সুলভ অর্থহীন চটক স্পর্শ করতে পারেনি অমিতাভ-জায়া জয়াকে। অভিনয় জগতে থাকার সময় সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গীটুকু ছিল তার সবচেয়ে বড় পুঁজি। স্বামী অমিতাভর পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানে এসে এটাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাচ্ছেন। ছোট-ছোট ঘরোয়া সভায়, বাড়ি-বাড়ি প্রচারের সময় এলাহাবাদের প্রমীলা মহল তার কাছে খুলে দিয়েছেন নিজেদের মনের জানলা। এভাবে বোধহয় অমিতাভ ও পৌছতে পারতেন না তাদের কাছে। সারাদিন অজস্র মিটিং করছেন জয়া। এরই ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর তত্ত্বাবধান। সন্দেহ নেই মহিলাদের ভোট টেনে আনার কাজে জয়া বিরাট সহায় হবেন। স্বামীর পাশাপাশি তিনিও নেমে আসতে চান এই শহরের সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ মহিলা সমাজের নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে। যেরকম তিনি যুক্ত থাকেন বম্বেতে। ৬ তারিখ ৭-৩০ নাগাদ সার্কিট হাউসে আচমকাই জয়াকে পেয়ে যাই। একটুর জন্য বুড়ি ছুঁয়ে আবার প্রচারের কাজে বেড়িয়ে যাচ্ছেন। সাদা সোয়েটার, সাদার ওপর সবুজ লতা-পাতা ছাপা শাড়ী হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখে রাখার প্যাড। জয়াকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বসে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় ছিল না। গাড়িতে যেতে যেতে আমাদের কথা হয়।

প্রশ্নঃ এই সভা-সমিতি, রাজনীতির ঝড় ঝাপটা এতে তো আপনারা একেবারেই অভ্যস্ত ছিলেন না.... এই পরিবর্তনটা আপনি কিভাবে নিয়েছেন ?

জয়াঃ এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আগে কখনও আমরা ভাবিনি যে রাজনীতি করব। যদিও সমাজসেবার কাজ অনেক করেছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এখানকার মেয়েদের দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি ঘর-সংসারের বাইরের পৃথিবীর কথা, এমনকি নিজেদের ভালোও কিভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে তাদের কোন ভাবনাই নেই।

প্রশ্নঃ ইন্ডাস্ট্রির কি রকম রি-অ্যাকশন-

জয়াঃ নমিনেশান ফাইল করার পর ওদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই।

প্রশ্নঃ রাজনীতিবিদদের ব্যাক্তিগত জীবন বলতে প্রায় কিছুই থাকে না – এটা কি আপনি মেনে নিতে পারবেন ?

জয়াঃ আমার মনে হয় না এটা কোন সমস্যা হবে। সবটাই বোঝা-পড়ার ব্যাপার। আমি ওর কাজে কখনই বাধা হয়ে দাঁড়াব না। তবে আগের চাইতে ওর সঙ্গে দেখা হবার সময় কমে গেছে। বাড়ি ফিরে শুধু চিরকুট পাই "আমার কুর্তা কোথায়। কোট কোথায়"

প্রশ্নঃ আচ্ছা এই যে ভিড় অমিতাভকে ঘিরে এটা কি উনি কংআই প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন বলে না কি ওর ফ্যানডম – কিসের জোরে জিতবেন অমিতাভ, ওর নিজের ইমেজ অথবা কংগ্রেসের আদর্শ।

জয়াঃ ওকে ঘিরে ভিড় আছে ঠিক কথাই – কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শের জন্যই ও ভোট পাবে। ব্যাক্তি হিসাবে ওর ভূমিকা দ্বিতীয়।

প্রশ্নঃ প্রচারে গিয়ে কি বুঝছেন ফিল্ম-ক্রেজ শহরে বেশি না গ্রামে ?

জয়াঃ শহরে, এখানে মানুষও ভীষণ অসংযত – প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে ভিড় সামলাতে সামলাতে। গ্রামে মানুষ অনেক ভদ্র। হুজুগে মানুষের সংখ্যাও কম।

প্রশ্নঃ আচ্ছা ফিল্ম লাইফ আর পলিটিক্যাল লাইফের মধ্যে তফাৎ কোথায় – মিলই বা কি ?

জয়াঃ নেতারা অভিনেতাদের চাইতে বড় এ্যাক্টর। পর্দায় আমরা বানানো ব্যাপার করি করি এখানে সবটাই আসা।

প্রশ্নঃ ভোটে জিতলে অমিতাভ কি মন্ত্রী হবেন ?

জয়াঃ আমি এসব কিছুই জানি না।

প্রশ্নঃ কিভাবে ক্যাম্পেন করছেন আপনি ? গ্রামে না শহরে ? কি রকম রেসপন্স পাচ্ছেন ?

জয়াঃ আমি মূলতঃ শহরেই কাজ করছি। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। দারুন সাড়া পাচ্ছি। মহিলারা, সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যার কথা বলছেন। এতদিন পর্যন্ত কোন নেতাই এই শহরটাকে নিয়ে সেরকমভাবে ভাবেননি। এখানকার মানুষদের তাই ধারণা। (গাড়ির জানলা দিয়ে শহরের রাস্তার দিকে আঙুল দেখালেন জয়া) আমরা এই শহরটাকে বদলে দিতে চাই। আমরাতো এই শহরের লোক।

প্রশ্নঃ শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুর ধাক্কা কংআই কাটিয়ে উঠতে পারবে ?

জয়াঃ একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়। তবে রাজীবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আছে আমাদের। ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে ও একটা পরিচ্ছন্ন কংগ্রেস চায়। সেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের কোন জায়গা নেই। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা কংগ্রেসে গুরুত্ব পাবে। রাজীব দেশকে ভাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলেই মনে হয় আমার। রাজনীতিতে নতুন রক্ত আসুক....

প্রশ্নঃ স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা আপনাদের ব্যবহারে খুশী নন, অমিতাভ'র নমিনেশান নিয়েও নাকি বিক্ষোভ আছে'।

জয়াঃ দেখুন রাজনীতিতে ঘোর প্যাঁচ আমরা অতটা বুঝি না কিছু বাজে লোক নানা ধরনের কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা আমাদের মত করে কাজ করছি। সৎ, নিষ্ঠাবান তরুনদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে আস্তে আস্তে, আমরা তাদের মিট করছি, কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্নঃ রামায়নের গল্প, হিন্দু আচার ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে বেশ ভালই তো বলছেন আপনি.... আগে থেকে প্র্যাকটিস করেছিলেন নাকি ?

জয়াঃ হেসে, না আসলে কিছু বলতে হবে বলে কোন কথা বলছি না আমি। শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যু আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমরা মানুষদের জন্য কাজ করতে চাই সেই কথাই তাদের বলছি। এটা ঠিক বক্তৃতা নয়.... উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজভাবে বোঝানো যায় লোকের কাছে ফাঁকা কোন প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছিনা – লোকেও অন্ততঃ এটা বুঝছেন এরা আর যাই হোক চুরি করবে না।

প্রশ্নঃ তা ঠিক আপনাদের যা স্বাচ্ছল্য তাতে চুরির দরকার পড়ে না।

জয়াঃ না ভাই, বাইরে থেকে দেখলে ওরকম মনে হয়, ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের খবর তো জাননা।

প্রশ্নঃ অন্য কোন তারকা কি আপনাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে.....

জয়াঃ কিছু জানি না ভাই, নানারকম গুজব শুনছি....

প্রশ্নঃ প্রচারের ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনারা প্রচুর খরচ করছেন।

জয়াঃ আমরা নিজেরা কিছু করছি না। দল থেকে প্রত্যেক জায়গায় প্রার্থীদের জন্য যা খরচ করা হয় এখানেও তার কোন ব্যাতিক্রম হচ্ছে না।

প্রশ্নঃ ও আপনি কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছেন। কংগ্রেসের আদর্শ, গান্ধীবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এগুলি সম্পর্কে আপনার কোন ধারনা আছে ?

জয়াঃ বিরাট কিছু নেই। এগুলি সম্বন্ধে আরো জানার চেষ্টা করছি। মানুষের প্রয়োজনের কথা বলাটাই আসল কাজ। প্রচারে বেড়িয়ে একটা কথা বুঝছি। ভোটারদের ভুল ভাল কিছু বোঝান যাবে না। আমাদের পলিটিক্যাল লিডাররা এদের আন্ডার এস্টিমেন্ট করেন কিন্তু ভোটাররা ভীষণ কনসাস।

প্রশ্নঃ আপনার উপস্থিতি কি বাঙালী ভোটারদের ভোট বেশি টানবে ?

জয়াঃ ওরা উল্টোদিকে একটা ধারনা চালু করার চেষ্টা করছেন যে আমি নাকি শুধু বাঙালি বাঙালি করি। সেরকম কিছু নেই। এখানকার বাঙালিদের মিট করেছি, বেঙ্গলি ক্লাবে গেছি – ওরা বলেছেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রশ্নঃ একজন ফিল্মের হিরো যখন পলিটিক্যাল হিরো হতে চায় তখন আসল অসুবিধাটা কি হয়।

জয়াঃ ফিল্মের হিরো সব অসম্ভবকে সম্ভব করে দেন তাই তাকে ঘিরে মানুষের আকাঙ্খাও বেশি। তিনি যখন আবার রাজনীতিতে আসেন তাকে নিয়ে মানুষের এক্সপেক্টেশানও বেশি থাকে – এটা সময় সময় সমস্যাও।

প্রশ্নঃ রাজনীতিতে আসার আগে কি আপনাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়েছে ?

জয়াঃ ব্যাপারটা খানিকটা আকস্মিক....ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানায়। এটা একটা নোবল কাজ। আমি কোন আপত্তি করিনি। ওর বাড়ির লোকেরাও কোন আপত্তি করেননি।

প্রশ্নঃ বহুগুণাজি বলছেন আপনারা নন-সিরিয়াস, নৌটঙ্কি,....

জয়াঃ দেখুন আমরা লেখক পরিবারের মানুষ আমাদের রুচি অন্য তাই এবিষয়ে কোন কথা বলব না। মানুষই এর উত্তর দেবে তবে এখানকার লোকেদের বহুগুণা সম্পর্কে ধারনা ভাল না। পাঁচ-ছটা মিটিং সেরে জয়া সার্কিট হাউসে ফিরে এলেন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। আমি এখান থেকেই তাকে ছেড়ে দিই। □

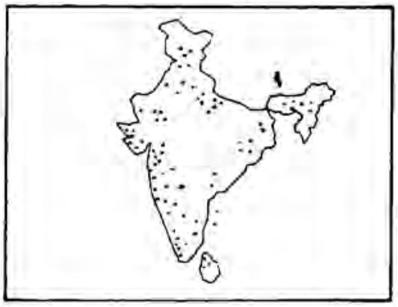

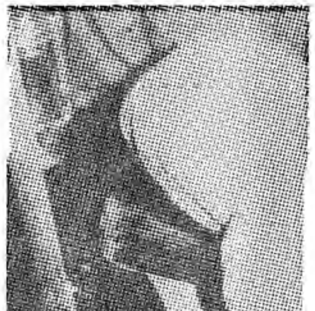

প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা: মালদা

গণির জয় নিয়ে মালদায় দ্বিধা নেই

মালদা জেলায় লোকসভা কেন্দ্র মূলত: একটিই–মালদা কেন্দ্র। কালিয়াচক, সুজাপুর ইংলিশ বাজার ওল্ড মালদা, হবিবপুর, মানিকচক ও আড়াইডাঙা এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে মালদা লোকসভা কেন্দ্র গঠিত। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা ও রতুয়া–এই তিনটি বিধান সভা কেন্দ্র রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়েছে।

মালদা লোকসভা, কেন্দ্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন মোট আট জন। এরা হলেন–কংগ্রেস(ই)র বরকত গণিখান চৌধুরী, সি.পি.এম এর দিনেশ জোয়ারদার, ভারতীয় জনতা পার্টির তুষার কান্তি ঘোষ, দুরদর্শী পাটির নারায়ন আগরওয়ালা, আর নির্দল হিসেবে

- সিদ্ধার্থ গুহরায়

দাঁড়িয়েছেন বিশ্বনাথ গুহ, সাইদুল, বিজয় সরকার ও প্রবোধ দাস, তবে মালদা কেন্দ্রে মূল প্রতিযোগী দুজন–বরকত আর দিনেশ জোয়ারদার।

পশ্চিমবাংলার অন্যান্য এলাকা থেকে মালদা নির্বাচনী কেন্দ্রের চরিত্রটা কিছুটা আলাদা। এর কারণ দুটি–এক, মালদা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কেন্দ্র আর দুই, পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলা থেকেই মালদা জেলায় কংগ্রেসের নিজস্ব ভোট কিছু বেশি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চাকরি দেবে এরকম একটা হাওয়া সব সময়েই মালদা জেলায় রয়েছে। ভোটের আগে এই হাওয়াকে একটু জোড়ে বইয়ে দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ফয়দা লোটার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। কিন্তু বাদ সেধেছে কংগ্রেসের আভ্যান্তরীণ কোন্দল। প্রাক্তন এম. এল. এ ও যুবনেতা গৌতম চক্রবর্তীর সাথে বরকতের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল বেশ কয়েকদিন আগেই। তারপর বরকতের সম্পর্কের অবনতি ঘটল জেলার আই. এন. টি. ইউ. সি. সভাপতি বিশ্বনাথ গুহের সাথে। গতমাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই একটা খবর মালদায় রটতে শুরু করলো গৌতম চক্রবর্তী বরকতের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়বেন। কিন্তু নভেম্বরের ২২–২৩ তারিখ নাগাদ হঠাৎ কংগ্রেস মহল থেকেই খবর পাওয়া গেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মালদা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হয়ে লড়বেন। এখবর রটার সাথে সাথে, মুখে কিছু না বললেও সি. এম. নেতাদের চোখে মুখে এক সন্তুষ্টির ছাপ দেখা গেল। অবশেষে, মনোনয়ন পত্র পেশ করার শেষ দিনে জেলার আই. এন. টি. ইউ. সি. র সভাপতি ও কংগ্রেস(ই) লেবার সেল নেতা বিশ্বনাথ গুহ সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন। মালদা জেলায় বিশেষত: শহর অঞ্চলে বিশ্বনাথ বাবুর পরিচিতি ভালোই। সুতরাং তাঁর প্রার্থী হওয়া বরকত সাহেবের সামনে একটি শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে–এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও কংগ্রেস(ই) যুব নেতা শ্যামা চৌধুরী ও ঘাসুদুর রহমান মনে করেন যে কেউ ভোট কেটে বরকত সাহেবকে হারাতে পারবে না। তাদের দৃঢ় ধারণা বরকত গণি খান '৮০ সালের থেকে আরও বেশি ব্যবধান রেখে জিতবেন। তাঁদের বক্তব্য একটি উপেক্ষিত, অনাদৃত জেলাকে নতুন করে তৈরী করেছেন বরকত। প্রচুর বেকার যুবককে চাকরি দিয়েছেন বরকত। সুতরাং মালদার মানুষ বরকত সাহেবেরে সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

কিন্তু বিশ্বনাথ পন্থীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা বলছেন বরকত কোনদিনই চাকরির ভাওতা ছাড়া কিছু দেন নি। তাদের বক্তব্য বরকত মিথ্যে কথা বলাও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপারটাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাই এত দুর্নীতি সত্ত্বেও মালদার অনেক সৎ কংগ্রেসী বরকতের সাথে রয়েছে। তাঁদের আরও বক্তব্য–বরকত সংগঠনের পরিপন্থী কার্যকলাপে সিদ্ধ হস্ত। স্বেচ্ছাচারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পার্টি চালাতে চান। প্রয়াত যুব নেতা স্বপন মিত্রের স্ত্রী সাবিত্রী মিত্রকে (ওরফে মানা মিত্র) রাতারাতি জেলা কংগ্রেসের নেত্রী বানিয়ে দিয়েছেন বরকত। যার কোন রাজনৈতিক পটভূমিকা ছিল না–তাকে জেলা কংগ্রেসের নেত্রী করা হলো কেন–এ প্রশ্ন অনেকেই তুলছেন। গত ২৬শে নভেম্বর মানা মিত্র ইংরেজবাজারের যদুপুর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে যান। কিন্তু বিক্ষুব্ধ কিছু কংগ্রেস কর্মী তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

সি.পি.এমের এর তাঁবুতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। ভেতরে যাই থাক না কেন ওপরে সকলে এককাট্টা হয়ে দিনেশ জোয়ারদারের হয়ে প্রচার করে যাচ্ছেন। এমন কি ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরাও সি.পি.এম সাথে পূর্ণ সহযোগীতা করছে। দিনেশবাবু নিজেই বললেন, সি.পি.আই এর কাছ থেকে আমরা পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগীতা পাচ্ছি। তবে জেলার কিছু জায়গায় আমাদের কর্মীদের সাথে আর. এস. পি কর্মীদের সামান্য ভুল বোঝাবুঝি আছে। তবে নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে এই ভুল বোঝাবুঝি অচিরেই মিটে যাবে।

কংগ্রেস(ই) তাঁবুতে ভাঙন ও সি.পি.এম তাঁবুতে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও সি.পি.এম কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছে না আমরা জিতবই। তার কারণ মালদায় কংগ্রেসের সমর্থক ভালোই। তার ওপর গণিখানের নিজেরও কিছু ভোট আছে। সারা ভারত

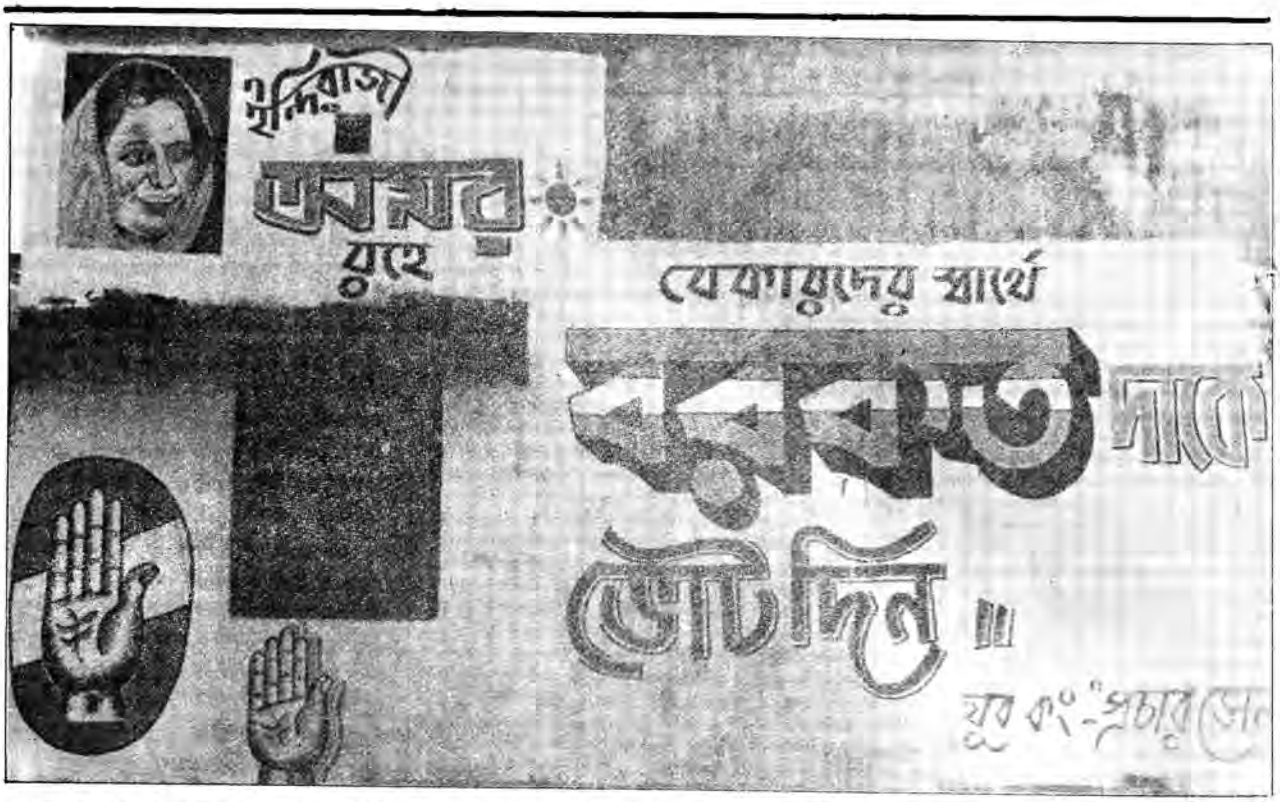

কৃষক সভার সম্পাদক ও রাজ্যসভার সি.পি.এম সদস্য শান্তিময় ঘোষও বললেন মালদায় কি হবে বলা যাচ্ছে না। কারণ অপোজিসন্ খুবই ফরমিডেবল। তবে আগের থেকে আমাদের অবস্থা অনেক ভালো। আমাদের জেতার সম্ভাবনা মালদা কেন্দ্রে খুবই বেশি।

নির্বাচনী প্রচার দুটি দল দুভাবে করছে। বরকত সাহেব এখন পর্যন্ত একাই কেল্লা রক্ষা করছেন। সমস্ত সভাতে তিনিই বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু সি.পি.এম নেতারা ও মন্ত্রীরা সমানে মালদায় আসছেন, যাচ্ছেন। শান্তিময় ঘোষ, মনসুর হবিবুল্লা, সুভাষ চক্রবর্তী প্রভৃতি সি.পি.এম নেতারা মালদা ঘুরে গেছেন। জ্যোতিবাবু খুব শিগ্‌গিরই মালদা যাচ্ছেন। তাছাড়া পল্লীতে পল্লীতে গ্রুপ মিটিং করে বেড়াচ্ছে সি.পি.এম। কিছুদিন আগে অভিনেতা স্বরূপ দত্ত মালদা ঘুরে গেছেন। গ্রামে গঞ্জে বেশ কিছু গ্রুপ মিটিংও করেছেন তিনি। গ্রুপ মিটিং করে শ্রোতাদের বলার সুযোগ দিচ্ছেন সি.পি.এম বামফ্রন্ট বিরোধী প্রশ্ন করছেন। নেতারা তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। ফ্রন্ট গত সাত বছরে কি কি করতে পেরেছে আর কি করতে পারেনি তা জানিয়ে দিচ্ছে ভোটারদের।

কংগ্রেস জোর দিচ্ছে জেলার উন্নয়নের দিকে। কংগ্রেস দল থেকে বলা হচ্ছে 'উন্নয়নের আরেক নাম বরকত গনি খান।' এক কংগ্রেস(ই) ছাত্র নেতা জানালেন, 'বরকতদার আমলে মালদা জেলায় কি না হয়েছে। স্টেডিয়াম, পার্ক, সুইমিং পুল, বড় বাড়ি–এসব কিছু তো মালদায় তৈরী হয়েছে, বরকতদার উদ্যোগে। তাছাড়া নতুন নতুন ট্রেন বের করে বরকতদা প্রচুর বেকার ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন ও দেবেন। মালদার মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে বরকতদাকে সমর্থন করবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে'। কিন্তু সি.পি.এম এর ছাত্র সংগঠন এস. এফ. আই এর এক নেতা বললেন, 'উন্নয়ন বলতে

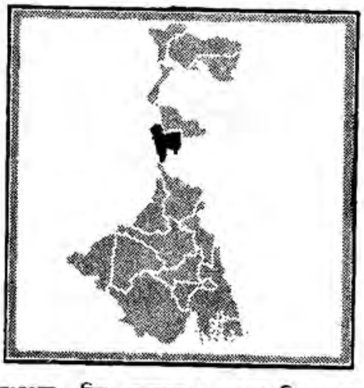

কংগ্রেস কি বোঝে? কতগুলি বৃহৎ অট্টালিকা বানালেই কি উন্নয়ন হলো? এই তো কয়েকদিন, আগে ইংরেজবাওজারের মঙগলবাড়ির কাছে রাজ্যসরকারের উদ্যোগে একটি তাঁত বিহীন তন্তুবায় কল্যান সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছে। যে সব তাঁতিদের নিজস্ব তাঁত নেই অর্থাৎ যারা এতদিন মহাজনদের তাঁতে কাজ করতো– তাঁরা এখন এই সমবায় সমিতিতে স্বাধীন ভাবে কাজ করছে। একশোটি তাঁত বসানো হয়েছে। তাঁতের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এই সমবায় সমিতি তৈরী করতে রাজ্য সরকারকে দুলক্ষটাকা ব্যয় করতে হয়েছে। আর এর এক ফার্লং এর মধ্যে বরকত সাহেব এক কোটি টাকা ব্যয়ে গৌড়ভবন তৈরী করেছেন। তাতে কি লাভ হয়েছে? কেন্দ্রীয় নেতারা এসে এই বিলাসবহুল বাসগৃহে এক রাত্রি কাটিয়ে যান। আর চাকরির ব্যাপারটা? চাকরি আমাদের সময়েও প্রচুর হয়েছে। সি.পি.এম সদস্য অধ্যাপক দেবতোষ দত্ত স্কুল বোর্ডের সভাপতি হবার পর মালদার প্রায় হাজার দুই ছেলে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা পেয়েছে। তবে আমরা এগুলো বলে বেড়াই না। কারণ যেহেতু রাজ্য সরকারে আছি, জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখা একটা সাধারণ দায়িত্ব। এটা আমাদের পালন করতে হবে।' বিশ্বনাথ পন্থী ছাত্র নেতা উজ্জ্বল কুমার দে বললেন, 'কিছুদিন আগেও আমরা সুশোভিত উদ্যান অথবা সুবিশাল অট্টালিকা নির্মানকে উন্নয়নের এক একটি ধাপ বলে ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখছি কয়েকজন মুষ্টিমেয় ঠিকাদারকে কনট্রাকট পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই এ গুলোর মধ্যে। উৎপাদনহীন উন্নয়নের কোন মানে হয় না। আর চাকরি দেবার ব্যাপারটা বরকত সাহেবের ভাওতা। প্রতিবারই ভোটের আগে তিনি বলেন চাকরি দেব, ভোট হলেই ভুলে যান।' সি.পি.এম কিন্তু স্বীকার করছে বরকত সাহেব চাকরি দিচ্ছেন। কিন্তু নিয়োগ অবৈধ। কেন্দ্রীয় সরকার যখন নিয়োগ বন্ধ রেখেছে, বরকত সাহেব রেলে লোক ঢোকান কি করে? দারিদ্র কবলিত মালদা জেলার লোকের কিন্তু নিয়োগ বৈধ

না অবৈধ এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তাদের মাথা ব্যথা ঘরের ছেলেরা চাকরি পেল কি পেলনা? এই সুযোগটা বরকত সাহেব নষ্ট করছেন না সি.পি.এম যতই 'নিয়োগ অবৈধ' বলে চ্যাঁচাচ্ছে, বরকত সাহেব বলছেন, 'সি.পি.এম যতই বাধা দিক চাকরি আমি মালদার ছেলেদের দেবই—দল, মত, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই দেব।'

গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের মধ্যে ভোট নিয়ে মাথা ব্যথা কম। হবিবপুরের বিক্রমহেমব্রেম বললেন, 'ফসল কাটার মরসুম এখন। ভোট নিয়ে ভাবার সময় পাচ্ছি না।' ধরমপুরের বিশু কর্মকার বললেন, 'ভোটের আর কোন মানে বুঝি না, যেই ক্ষমতায় আসুক গ্রামের গরীবদের কোন লাভ হবে না।' মানিকচক থানার বাঙিটোলার ক্ষেতমজুর ভোলা প্রামানিক বললেন, 'সি.পি.এম আসাতে বর্গাদারদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ক্ষেতমজুরদের বিশেষ কিছুই হয় নি। তবুও সি.পি.এমকে ভোট দেব। যদি কিছু করে ওরাই করবে। কোটি টাকা ব্যয়ে গৌড়ভন কিংবা হুসেন শাহ পার্ক গ্রামাঞ্চলের গরীবদের কোন কাজে লাগেনা। কলকাতার সাথে যোগাযোগ ভালো করার জন্য ট্রেন বাড়ালেও এদের কোন লাভ হয় না। তবুও দারিদ্রক্লিষ্ট সীমিত ক্রয় ক্ষমতা বিশিষ্ট এই লোকগুলোর অনেকেরই ধারণা গণিখান চৌধুরীর প্রাণ মালদার জন্য উৎসর্গীকৃত। জেলার কোন উন্নতি করলে তিনিই করবেন।

বরকত সাহেব, গতবার জিতেছিলেন ১২০০০ এর কিছু বেশি ভোটে। গতবার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বরকত সাহেব সি.পি.এমএর থেকে ২৫০০০ এর মত ভোট বেশি পান। '৮৪ র পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি.পি.এম ব্যবধান নামিয়ে এনেছে ১৩,০০০ এ। এবার বরকত সাহেব খুব বেশি হলে ব্যবধান রাখতে পারবেন বিশহাজারের মত। কালিয়াচক কেন্দ্রে '৮৩ সালে বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস(ই) পাঁচহাজার ভোটের ব্যবধান রেখে জিতেছিল। এবার ব্যবধান কমে খুব সম্ভবত: হাজার দুয়েকে দাঁড়াবে। কালিয়াচকের কিছু বিড়ি শ্রমিকের ভোট বিশ্বনাথ গুহ পাবেন। সুতরাং এই বাইশহাজার ভোটের ব্যবধান সি.পি.এমকে কমাতে হবে বাকি পাঁচটি কেন্দ্র থেকে। পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে মানিক চকও ওল্ড মালদায় রয়েছেন কংগ্রেস(ই)র এম. এল. এ.। মানিকচকে কংগ্রেস(ই)র জুখিলাল মন্ডল জিতেছিলেন ৪৭৪ টি ভোট বেশি পেয়ে। কিন্তু জেলার খবর এই দুই এম. এল. এর কেউই বরকত সাহেবের সাথে সহযোগিতা করছেন না। তাতে সি.পি.এম এর বাড়তি সুবিধা হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও সি.পি.এমকে বরকত সাহেবের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য প্রচুর খাটতে হচ্ছে।

এর ওপর রয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। গত ৪ঠা ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে 'বিশাল হিন্দু যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হলো মালদায়। এর প্রভাব পড়বে কিছু হিন্দু সাম্প্রদায়িকের ওপর। এই ভোট গুলো পাবেন বি. জি. পি. প্রার্থী তুষার কান্তি ঘোষ। এই ভোট গুলোর অধিকাংশই কংগ্রেসের ভোট। কিন্তু এমন কিছু হিন্দু সাম্প্রদায়িক আছে যারা বরকত সাহেব মুসলিম বলে তাঁর ভোট কিছু কাটবেনই। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বরকত সাহেবের প্রতিপত্তি খুবই ভালো। ১৩ই ডিসেম্বর ফারুক আবদুল্লা মালদায় এসেছেন। সি.পি.এম এর হয়ে প্রচার করার জন্য। এই ঘটনার মধ্যে মালদার মুসলিম ভোটারদের তোষণ করার কোন অশুভ উদ্দেশ্য সি.পি.এম এর নেই তো? □

WITH BEST COMPLIMENTS FROM —

SOIL AND FOUNDATION ENGINEERS

12/1B, LINDSEY STREET

CALCUTTA—700 087

আমরা কখনোই জোর দিয়ে বলিনি কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার হবে
—সমর মুখার্জী

□ ৭১ সাল থেকে আপনি হাওড়া কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হচ্ছেন। এবার হাওড়া কেন্দ্রে নির্বাচনী লড়াই গত তিনবারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কি?

□ ভারতের এই অষ্টম লোকসভা নির্বাচন নিশ্চয় জাতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আজ ভারতবর্ষের মেরুদন্ডে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, সেই দিক থেকে কেন্দ্রে এমন একটি সরকারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যে সরকার এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদের উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারবে। আর তাছাড়া সমস্ত পৃথিবী ভারতের এই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর নজর রেখেছেন। সেই দিক থেকেও এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি পৃথকভাবে হাওড়া কেন্দ্রের কথা বলেন তবে বলব, না এবারের হাওড়া লোকসভা নির্বাচনে তেমন কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। প্রিয়রঞ্জন দাঁড়িয়েছে বলে আমরা ভীত নই। এসব কংগ্রেসীরা বলে, ভারতবর্ষের ভোট হয় দল ভিত্তিক ব্যক্তি কেন্দ্রীক নয়।

□ কংগ্রেস মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আপনি হাওড়া কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিন নির্বাচিত হলেও হাওড়ার উন্নতির জন্য আপনার কোন অবদান নেই। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

□ দেখুন আমি গণিখান নই, বাংলার জন্য এই করেছি, ওটা করে দেব এ সব তো মশাই সংকীর্ণতার কথা। শুধু হাওড়া কেন আমি চাই সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতি। আর তার জন্য বহু আন্দোলনও করেছি এবং করব। তার প্রমাণ হিসাবে বলতে পারি মার্টিন রেল স্থায়ীভাবে চালু করবার জন্য আমি নিজে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছি। তাছাড়া হুগলী ডক, পুল ইঞ্জিনিয়ারিং রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আমার চেষ্টায় হয়েছে। এ'রকম বহু কাজ করেছি। এক কথায় যদি বলি তবে বলব আমি শুধু হাওড়ার নই, সমস্ত ভারতের।

□ হাওড়ার উপনির্বাচন বা কর্পোরেশন অথবা বালী মিউনিসিপালিটির নির্বাচনী ফলাফল কি এবারের লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্রে কোন প্রকার প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

□ না পড়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, ওসব নির্বাচনের ফলাফল লোকাল সমস্যার উপর নির্ভরশীল। আর লোকসভা হচ্ছে ব্যাপক, এর গুরুত্ব অনেক গভীরে।

যদি হাওড়ার উপনির্বাচনের কথা বলেন, তবে বলব কানাই ভট্টাচার্যের তুলনায় সত্যেন ঘোষ কিছুই নয়। আর কংগ্রেস প্রার্থী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন ঘোষের তুলনায় অনেক বেশী পরিচিত নেতা। সুতরাং জেতাটাই আমাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

□ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিবারই হাওড়া কেন্দ্রের ভোটারদের কাছ থেকে অভিযোগ শোনা যায়, আপনি নাকি সাধারণ মানুষদের কাছে যান না?

□ কে যায়? প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী? সেতো ভোটের জন্য এখন যাবেই। তার আগে কোনদিন গিয়েছিল? আপনার সাথে দেখা হলে এই প্রশ্নগুলো করবেন তো। শুনবেন কি উত্তর দেয়। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী কোনদিন তার কেন্দ্রের সব মানুষের ঘরে ঘরে যেতে পেরেছেন? আসলে এই অভিযোগ সাধারণ মানুষের নয়। এক শ্রেণীর কংগ্রেসের অপপ্রচার।

□ রাজীব গান্ধীকে তো আপনি দীর্ঘদিন দেখে আসছেন। লোকসভার প্রধান হিসাবে কতখানি যোগ্য বলে আপনার মনে হয়?

□ রাজীবজী লোকটিতো মন্দ নয়। আসলে ওঁর একটি কিচেন ক্যাবিনেট রয়েছে। ওটাইতো সব, ওরাই পরামর্শদাতা, যেমন চালাবে তেমনি চলবে। তবে যোগ্য কিনা সেটা কংগ্রেস ঠিক করবে। আমি নই।

□ জ্যোতি বসু আসামে নির্বাচনী সফরে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, এবার কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। এই কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে হবে বলে মনে করেন?

□ (বিরক্ত হয়ে) আপনি কিন্তু অনেক সময় নিচ্ছেন। এত সময় দেবার কথাতো ছিল না।

□ আমরা চেষ্টা করছি কংগ্রেসকে সরিয়ে দিয়ে কেন্দ্রে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য। তবে সেটা নিশ্চয় জনতার মত নয়। সেখানে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন কি করে বলব। আর আমরা কখনোই জোড় দিয়ে বলিনি কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার হবেই।

□ যদি কেন্দ্রে কংগ্রেসি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তবে আপনারা কি সেই কোয়ালিশন সরকারে থাকবেন?

□ কখনোই না, এ'কথা কতবার বলব।

□ পথে আসতে এক জায়গায় দেখলাম, 'যে কংগ্রেসিরা অকালিদের হত্যা করেছে তাদের একটি ভোটও দেবেন না।' এটা কি সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দেওয়া নয়?

□ কে কোথায় কি লিখছে এই নিয়ে এত মাথা ঘামালে চলবে না।

□ কেন, সি. পি. এম ক্যাডাররাইতো লিখেছেন?

□ ঠিকই লিখেছেন। আমার তো মনে হয় কংগ্রেস থেকেই লিখে দেওয়া উচিত ছিল যে সকল কংগ্রেস অকালিদের হত্যা করেছে তাদের একটি ভোটও যেন না দেওয়া হয়।

□ আমার বেশ মনে আছে 1st November প্রণবকে সঙ্গে নিয়ে রাজীবের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে বলেছি বেঙ্গলে কংগ্রেসিরা অকালিদের গণহত্যা করেছে। রাজীব আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি ম্যাসেজ শীঘ্রই পাঠাবেন। এই গণহত্যা বন্ধ করবার জন্য।

□ আপনারা কি অকালিদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছেন?

□ আপনাকে কে বলল? (উত্তেজিত ভাবে) আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। এত কথা বলতে পারব না।

পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে বহুবার কথা বলেছি। তখন তাকে বলেছিলাম সব অকালি খালিস্তান সমর্থন করেন না। ওদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন। চন্ডীগর ওদের দিয়ে দিন, আমার কথা শোনেননি। শুধু শুধু অকালিদের উপর দোষারোপ করলেই তো চলবে না।

□ আমার শেষ প্রশ্ন, আপনার কি মনে হয় এবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আগের চেয়ে অনেক বেশি ভাল ফল করবে?

□ ভাল করবে কিনা জানি না। তবে হয়ত শহর এলাকায় কিছু ভোট বেশি পাবে। ওটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। □

সাক্ষাৎকার □ অনুপ সরকার

'জয় পরাজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া নেই'

মানিক সান্যাল

অঞ্জন সিকদার

□ কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন কত সালে ?

মানিক সান্যাল: ১৯৫২ সালে।

□ কিভাবে ?

মা সা – তখন ছাত্র ব্লক করতাম। আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেলে গেছি। সেখানে হাওড়া জেলার প্রহ্লাদ দাসগুপ্তর সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি কাজ নিয়ে আলোচনা হত তারপর সুবোধদা (সুবোধ সেন) প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়। আস্তে আস্তে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি।

□ বাড়ির দিক থেকে কোন বাধা আসেনি ?

মা সা – না। যদিও বাবা ডা: চারুচন্দ্র সান্যাল ছিলেন নামকরা কংগ্রেসী তবুও তিনি আমাকে বাধা দেননি। বরঞ্চ নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

□ দলের সদস্যপদ পান কবে ?

মা সা – ৫৪ সালের পরে, ৫৬-র পর থেকে হোলটাইমার।

□ প্রথম থেকেই কি মূল সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ?

মা সা – না। শুরুতে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার ছাত্র সংগঠনের অনেকটা দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। তারপর ট্রেড ইউনিয়ান ফ্রন্টে আসি। এখনও ওখানেই আছি।

□ জেলে কবার গেছেন ? জরুরি অবস্থার সময় কোথায় ছিলেন ?

মা সা – সদস্য হওয়ার পর আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিন চারবার জেলে গিয়েছি কিন্তু জরুরি অবস্থায় যাইনি। আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম।

□ সি পি আই এমের জন্মলগ্ন থেকেই কি আপনি তার সঙ্গে ?

মা সা – হ্যাঁ।

□ আপনি কি মনে করেন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি, আদর্শ রূপায়ণ এখনও সম্ভব ? সি পি এম কি তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না ?

মা সা – হ্যাঁ নীতি, আদর্শ রূপায়ণ এখনও সম্ভব। সি পি আই এম কোনদিনই তার থেকে দূরে সরে যায়নি। বরঞ্চ সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

□ এই প্রথমবার কি জনগণের রায়ের মুখোমুখী হচ্ছেন ?

মা সা – প্রায় তাই। ৫৬ সালে জলপাইগুড়ি এ সি কলেজে ছাত্রসংসদের সহ সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। একবার পুরসভাতেও দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু সে নির্বাচন হয়নি। তারপরে এই।

□ আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে –

মা সা – কি আর করা যাবে। কারুর মুখতো আর বন্ধ করতে পারব না। ওসব কোন ছোট বয়সের দু একটা ঘটনা। আর লোকে অতীতের কথা তুললে বর্তমানের কথাই বা বলবে না কেন ?

□ সুবোধবাবু নাকি আপনার হয়ে কাজ করছেন না ?

মা সা – কে বলেছে ? সুবোধদা সমস্ত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।

□ বামফ্রন্টের শরিকী কোন্দল নিয়ে আপনি কি চিন্তিত না ?

মা সা – একেবারেই না। ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, সি পি আই সবাই একসঙ্গে কাজ করছে। কোন সংঘর্ষ নেই।

□ নির্বাচনে যদি জেতেন তাহলে কি করবেন।

মা সা – জিতলে কি করব সেটা এখন উহ্য।

□ আর হেরে গেলে ?

মা সা – জয় পরাজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া নেই।□

'আমি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছি'

সুবোধ সেন

□ আপনাকে দলের টিকিট দেওয়া হল না কেন ?

সুবোধ সেন – কে বলেছে দেওয়া হয়নি ? আমি নিজেই দাঁড়াতে চাইনি।

□ কিন্তু বামফ্রন্ট ও সি পি আই এমের যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে প্রথমে আপনার নাম ছিল।

সু সে – আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি। আমি সি পি আই এমের জেলা সম্পাদক। দলের দুটো দায়িত্বে থাকতে চাইনা। তাছাড়া বয়সটাও একটা কারণ। আমি অসুস্থ।

□ কিন্তু প্রথমে এক পরে আর এক। এই ব্যাপারটা কি সি পি আই এমেরভেতরে কোন্দলকে চিহ্নিত করে না ?

সু সে – কোন্দলের কোন প্রশ্নই নেই। আমরা অর্গানাইজড পার্টি।

□ মানিকবাবুর মনোনয়ন নিয়েও তো আপনাদের ভেতরে অনেক গোলমাল হয়ে গেছে ?

সু সে – একেবারেই না। আমাদের সকলের পরামর্শেই মাণিকবাবুকে প্রার্থী করা হয়েছে।

□ এম পি থাকাকালীন আপনি নাকি এই কেন্দ্রের জন্য কিছুই করেন নি ?

সু সে – ব্যক্তিগতভাবে করার আবার কি আছে ? আমাদের সব কিছুই দলের মাধ্যমে হয়। তবে সদস্য থাকাকালীন কিছু অফিস এখানে আনানো, ট্রেন বাড়ানো, শিল্পেরপ্রসার, চা বাগানের সমস্যা এইসব নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করেছি।

□ আপনি কি মানিকবাবুর হয়ে কাজ করছেন ?

সু সে – দলের হয়ে পুরোপুরি কাজ করছি। কমিটি নির্বাচন, সভা সমাবেশের ব্যবস্থা করছি। নির্বাচনের গোটা ব্যাপারটার পরিচালনার ভার আমার ওপর।

□ নির্বাচনের ফল কি আশা করছেন ?

সু সে – মানিকবাবু জিতবেন। আগের থেকেও বেশি ভোটে কংগ্রেস হারবে। □

ধান ক্ষেতি– রামনগরে পুলিশী তান্ডবের সময় এম পি অমল দত্ত একদিনও যান নি

মেহেতা মোক্তার হত্যার পর যে পুলিশী তান্ডব চলে তাতে এখানকার বাসিন্দারা যত না ক্ষুব্ধ, তার থেকে বড় অভিযোগ, স্থানীয় এম-পি অমল দত্ত সে সময় একদিনও এ এলাকায় পা রাখেন নি। এমনকি জ্যোতিবাবু গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটিতে ক্যাডারদের নিয়ে মিটিং করে চলে যান কিন্তু বিপর্যস্ত ও আতঙ্কিত বস্তিবাসীদের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিশেষ করে বাতিকল পাড়ার ভোটারদের ক্ষেত্রে এই ঘটনার প্রভাব বেশ পড়বে। উল্লেখযোগ্য, ধানক্ষেতি বাতিকল ১ও ২ নং ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ১৭,৬১০। তবে বর্তমানে এম.এল-এ মহঃ সামসুজ্জোহা কংগ্রেসের লোক। তবে তিনি জিতে ছিলেন মাত্র ৪৬২ ভোটে। জনতা ও নির্দল মিলিয়ে যে হাজার দেড়েক তা এবার কোন দিকে যাবে বলা যাবে না। মুসলিম লীগ প্রার্থী দাঁড় করালেও তেমন কিছু হেরফের হবে না। স্কুল শিক্ষক রফিক আহমেদ জানালেন, থানায় নিয়ে মারলে আল্যাদা কথা, পুলিশ বুড়ো লোকদের রাস্তায়-ধরে ঠেঙ্গিয়েছে। পানওয়ালা জিজরুরাহুল হক নিজে সি পি এম সার্পোটার। তিনিও স্বীকার করলেন এ নিয়ে পাড়ার মানুষের মনে যথেষ্ট দুঃখ আছে। লালবাজারে ইদ্রিশের মৃত্যুর ব্যাপারটি অবশ্য কোন ইস্যু হবে না। তবে বহু বেকসুর ছেলে ধরে রাখা হয়েছে। পাড়ার বহু পরিবারের কেসের উপরে কেসে জেরবার অবস্থা। 'কামানেবালা বহুত লেড়কাকো অন্দর কর দিয়া।' ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বস্তিবাসীরা। এদেরই একজন টেনে নিয়ে গেলেন তার ঘরে। 'দেখিয়ে ৫টো লেড়কা মেরা, দো বি-এ পাস. একদম বেকার।

এক ইদ্রিশ গয়া, হাজারো ইদ্রিশআয়েগা ইসি বেরোজাগরীকে কারণ সে, তব চিল্লানেসে কেয়া ফায়দা।' গোটা এলাকাটাকে ঘিরে আছে ঘন চিমনীর অরণ্য। গার্ডেনরিচ শিপ্ বিল্ডার্স, হিন্দুস্তান লিভার, জি.ই.সি., কেশোরাম কটন, আই.টি.সি. এরকম বহু ভারী শিল্পোদ্যোগ।

অথচ গার্ডেনরিচের ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের অধিকাংশকেই রুটি রুজির ধান্দা করতে হয় অনুৎপাদক উপায়ে। বিস্কুট, রুটি, ঘুড়ি, এরকম কিছু বস্তুর কারখানা আছে বটে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে যাবতীয় ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও ঐ খুপরিগুলোর তুলনায় পানের অথবা চায়ের দোকান, সাড়ে বত্রিশ ভাজা ফেরি আর সাট্টার প্যাডলেখা থেকেই ভাত জোগাড় হয় বেশি। যদিও স্থানীয় সি পি এমের কর্মী বিজয় সরকারের বক্তব্য 'সান অফ দ্যসয়েল দে'র চাকরীর প্রশ্ন তুলে সমস্যার আসল কারণটাই গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে তিনি স্বীকার করলেন মুসলিম যুবকদের বেকারী তীব্রতা কমানো যায় নি। গলির পরে খালি খাটাল, খাটা পায়খানা, পচা ডোবা, পাঁকপচা রাস্তা আর আবর্জনার মাঝে মাঝে এক একটা বস্তি। গত সাতটি নিবার্চনেও এই নিসর্গ চিত্র পাল্টায় নি। এবার কি পাল্টাবে? ধানক্ষেতি মসজিদের উল্টোদিকে মেথর পাড়ার মুখে সাট্টার প্যাড লিখছিলেন মহম্মদ রাজ্জাক। গার্ডেনরীচ শিপ্ বিল্ডার্সে কাজ করতেন। মেশিনে পা দুটো গেছে। বহু হাটাহাঁটি করেও তার জোয়ান ছেলের কাজের ব্যবস্থা হয় নি সেখানে।

তিক্ত গলায় জানালেন 'ইয়ে সব বাতে ছোড়িয়ে, আগর মেরে লেড়কা কো নোকরী দিলা দেঙ্গে, তো আপ যিসকো কহেঙ্গে উসিকোই ভোট দেগা'। □

□ নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশের মানুষের জন্য কোন দল কি করেছে?

প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র

হুগলি জেলার তিনটি কেন্দ্র। শ্রীরামপুর, হুগলি এবং আরামবাগ। গত '৮০র নির্বাচনে এই জেলার তিনটি আসনই দখল করেছিল সি. পি.এম। উত্তরপাড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে বেশ বড় বড় কিছু কলকারখানা। হিন্দমোটর কারখানার শুরু উত্তরপাড়া থেকে, শেষ হয়েছে প্রায় কোন্নগরের কাছে, ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম মোরটগাড়ির কারখানা। এছাড়াও রয়েছে শ' ওয়ালেস, হয়েলস পেন্টস, ভদ্রকালি ডি-ওয়ালডি, কোন্নগর ডি-ওয়ালডি, এন. টি. সি, জে. কে. স্টিল, স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস, চাঁপদানীতে নর্থব্রুক, অ্যাংগার্স ও চাঁপদানী জুট মিলের মত কারখানা।

সাধারণত: পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সি. পি. এমের প্রভাব অন্য সর্বভারতীয় দলগুলো থেকে বেশি। যে কারণে '৮০-র লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্রের সি. পি. এম প্রার্থী শ্রী অজিত বাগ ১,০৬,০০০ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র যে সাতটি বিধানসভা নিয়ে গড়ে উঠেছে তার পাঁচটি হুগলিতে। উত্তরপাড়া, চন্ডিতলা, চাঁপদানী, শ্রীরামপুর ও জাঙ্গীপাড়া এবং দুটি হাওড়া জেলায়, পাঁচলা ও জগৎবল্লভপুর। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখলাম সি.পি. এম. প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে আছে। দেওয়াল লিখনে সি.পি. এম. কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে। কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণায় দেরী হওয়ার দরুণই সি.পি. এমের এই অগ্রগতি। ইতিমধ্যে তাঁদের বেশ কিছু নির্বাচনী জনসভা করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকটাতেই স্থানীয় এম. এল. এ. ও পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে প্রথম পর্ব শেষ করেছে। তুলির শেষ ছোঁয়া মুখ্যমন্ত্রী ও বামফ্রন্টের প্রথম সারির নেতাদের। আগামী ২ ডিসেম্বর শ্রীরামপুর আর. এম. এস. ময়দানে বামফ্রন্টের প্রথম সারির নেতাদের নাম সম্বলিত একটা পোস্টার চোখে পড়ল। অবাঙগালী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অবশ্য কংগ্রেস(ই)র দেওয়াল লিখন হয়েছে।

এইবার একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত, সেটা হচ্ছে প্রার্থী বাছাই। সি.পি. এমের শ্রীঅজিত বাগ ভদ্রকালি হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক এবং কংগ্রেস (ইর) শ্রীবিমল কান্তি ঘোষ শ্রীরামপুর কলেজের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। একজন স্কুল ও অপরজন কলেজে পড়ান। পারস্পরিক কুৎসা রাজনীতির এক প্রধান মূলধন, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। সেই হিসেবে ভোটেরও কিছু তারতম্য ঘটে। '৮০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন পেশায় ডাক্তার অবশ্য তিনি এইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরামবাগ কেন্দ্র থেকে।

—পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য—

কংগ্রেসের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বও কংগ্রেসের প্রচারে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইহেতু কংগ্রেসের কর্মীর সংখ্যাও অনেক কম। কংগ্রেস কর্মীদের মুখেই শুনলাম অনেকেই ড: নাগের হয়ে খাটতে আরামবাগ চলে গেছে। কংগ্রেস প্রভাবিত অঞ্চল চাঁপদানী, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, জনাইরোড। এই সব অঞ্চলে কংগ্রেস কর্মীদের কর্মতৎপরতা চোখে পড়ল। বিশেষ করে অবাঙগালী অধ্যুষিত এলাকাগুলি। এই অঞ্চলগুলোতে বেশ বড় বড় শিল্প রয়েছে যেমন হিন্দমোটর, জে. কে. স্টিল, শ'ওয়ালেস, এবং এখানে শ্রমিকের অধিকাংশই অবাঙগালী। চাঁপদানী বৈদ্যবাটীতে রয়েছে তিনটি বড় বড় জুটমিল। নর্থব্রুক, অ্যাংগার্স এবং চাঁপদানী জুটমিল। গত দুবছর ধরেই অবশ্য এই তিনটি জুট মিল বন্ধ। তিনটি জুট মিলের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ষোল হাজারের মত, যাঁরা গত দু বছর ধরে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। বন্ধ এই তিনটি জুটমিলের কিছু শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে, এই তিনটি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে স্হানীয় বিধানসভা বিধায়ক শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জী। গত ২৭ তারিখে বৈদ্যবাটীতে এক নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রীর আসবার কথা ছিল এবং বন্ধ মিলের শ্রমিকরা ঠিক করেছিল যে মুখ্যমন্ত্রী এলে তাঁর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করবে। কিন্তু তাদের বাসনা সভাপতির কাছে পেশ করাতে তাঁর উত্তর হল 'এটা স্মারকলিপি পেশ করার জায়গা নয়, আমরা তাঁকে আনছি নির্বাচনী সভা করার জন্য, স্মারকলিপি পেশ করার জন্য নয়। পরে আপনারা সেটা মুখমন্ত্রীকে গিয়ে দিয়ে আসবেন, এখানে সেটা করতে দেওয়া হবেনা।' স্বভাবতই শ্রমিকরা বিধায়কের এই ধরনের আচরনে ক্ষুব্ধ।

পরে জানা গেল মুখ্যমন্ত্রী সেদিন সভাতে আসেন নি। তিনি পান্ডুয়া ও চুঁচুড়াতে সভা করে চলে গেছেন। ধরা যাক প্রত্যেকটি পরিবার হল ৪ জন মানুষ কে, নিয়ে তাহলে চৌষট্টি হাজার ভোট, তার অর্ধাংশও যদি সি.পি. এমের বিপক্ষে যায় তবে গতবারের তুলনায় ভোটের ব্যবধান কমবে নাকি?

পঞ্চায়েতে সি.পি. এমের পরাজয়:

'৮৩র পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনাই এর ১নং

ক্ষকে কংগ্রেস দখল করেছে সাতটা এবং সি.পি. এম চারটে। সেকারণে পঞ্চায়েত তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখানকার জনসংখ্যার অধিকাংশই চাকুরীজীবি। সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে। পুলিশ বা প্রশাসন থেকে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে ছা-পোষা মানুষদের একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে। নাম বলতে কেউ সাহস করছে না পাছে তার ওপর আক্রমনটা আসে। স্থানীয় এক প্রভাবশালী ডাক্তার ডঃ কুঞ্জলাল চ্যাটার্জীর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, গত পাঁচ বছরে কোনও উন্নতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে, এই যে রিক্সাওয়ালা দেখছেন আগে এরা জামা পড়ত না, (এমনকি তিনপুরুষের মধ্যে)। এখন এদের সাজ-পোষাকের উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই খেতে না পারলে এই রকম জামা কাপড় পড়তে পারতনা। ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না। রিক্সাওয়ালা সহাস্যে ডাক্তারবাবুর কথাকে সম্মতি জানাল। তিনি আরও বললেন, স্থানীয় যে জমিদার তাঁর জমি জবরদখল করে লোকেদের নামে করিয়ে দিলে, যারা পেল, তারা নিশ্চয়ই খুশী হবে এবং আমরা যেটা গোদা বাংলায় বলি পরের ধনে পোদ্দারী সেইটে করে কিছু লোক জনদরদী হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ আর একটা কাজ হয়েছে যে, ভাঙ্গা স্কুল বাড়ী ছিল সেগুলো সব পাকা বাড়ী হয়েছে। স্কুল শিক্ষকদের মাইনে বেড়েছে। এই আর কি। এখানকার স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, তিনি নির্বাচনের কাজে কোথায় গেছেন তাঁর বাড়ির লোকেরা বলতে পারলেন না।

এরপর কোন্নগরের বিভিন্ন অঞ্চল। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বললেন, তাঁরা কাজ করছেন উপেক্ষিত জনগণের জন্য। যাদের কথা কেউ ভাবেনা। রাস্তা-ঘাট, পাকা নর্দমা, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি জনহিতকর কাজ গত পাঁচ বছরে অনেক হয়েছে। ক্রাইপার রোড ধরে হাঁটিতে হাঁটিতে সি.পি. এমের দেওয়াল লিখনগুলো চোখে পড়ল বাহারী রঙে লেখা। কিছু কিছু জায়গায় পরিসংখ্যান দেওয়া রয়েছে। যার একটিতে দেখলাম রাজাওয়ারী পরিসংখ্যান খুন ও ধর্ষনের। পশ্চিমবঙ্গের স্থান ওপরে রেখে বাকি কংগ্রেস(ই) শাসিত রাজ্যগুলির নাম। পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছরে খুন ও ধর্ষনের ঘটনা যথাক্রমে ৩ ও ৫, এ পরিসংখ্যান তারা কোথায় পেলেন? স্থানীয় এক অধিবাসীর কাছে জানতে পারলাম গত পাঁচ বছরে শুধু মাত্র কোন্নগরেই খুনের ঘটনা ঘটেছে ১৭টি। এরপর নবগ্রাম ও কানাইপুরের পঞ্চায়েতে গেলাম। নবগ্রাম মধ্যবিত্তের বাস এবং কানাইপুরের অধিকাংশই কৃষিজীবি। স্থানীয় জনসাধারণ পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে খুশি। সেই কারণেই উপর্যুপরি দুবার পঞ্চায়েত সি.পি. এমের-ই দখলে।

শ্রীরামপুরের আর একটি কেন্দ্র জাঙ্গীপাড়া। এখানে বাজারের মধ্যে স্থানীয় সি.পি. এমের আঞ্চলিক কমিটি। খুবই কর্ম ব্যস্ত লোকজন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় দেখি পার্টির কর্মীদের ঘরোয়া বৈঠক চলছে। আমি পরিচয় দেওয়াতে, যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি আমারই সামনে বসা অমল সিংহরায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিই লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারি। কোন কাগজ, কি বৃত্তান্ত সমস্ত শুনে জানতে চাইলেন, আমি কি জানতে চাই।

□ আপনাদের এখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবি।

□ হ্যাঁ।

□ এখন তো ধান কাটার মরশুম চলছে। কোনও রকম শরিকি সংঘর্ষ বা কংগ্রেসের সঙ্গে....

□ না এখানে কোনও রকম গন্ডগোল হয়নি। আর তাছাড়া আমরা নিজেরাই উপস্থিত থাকি।

□ বর্গাদার রেকর্ড-এর পরিমাণ কি রকম।

□ আমাদের এখানে ৮০% বর্গাদার রেকর্ড হয়েছে। এক্ষেত্রেও আমরা একটা রেকর্ড করেছি।

□ গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কি কি কাজ হয়েছে?

□ যেমন ধরুন, '৮২ সালে একটা মেয়েদের হাইস্কুল। আর প্রাথমিক স্কুলগুলোকে দালান বানানো। গোটা আটেক ছোট ছোট পুল বানানো (কালভার্ট নয়)। আটটার মত বাস স্ট্যান্ড। প্রত্যেকটি বাস স্ট্যান্ডই রোদ-জলের হাত থেকে যেন যাত্রীরা বাঁচতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করেছি।

□ ইন্দিরার মৃত্যু বা এই লোকসভা নির্বাচন স্থানীয় কৃষিজীবিদের কি রকম প্রভাবিত করেছে?

□ না, কোন ওরকম প্রভাবই লক্ষ্য করিনি।

এখানে থেকে বিকেলের চা-খেয়ে এগিয়ে চলি জগন্নাথপুরের দিকে। সেখানে এক সেলুনে জমিয়ে গল্প চলছিল। নিজের পরিচয় দিতে একজন জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসতে দিলেন। নির্বাচন নিয়েই কথা চলছিল। দোকানের মালিক প্রশান্ত প্রামাণিক-এর কাছে জানতে চাইলাম, এখানে ভোটের হাওয়া কোন দিকে বইছে, একটু ইতস্তত: করে বললেন 'সি.পি. এমের দুটো নির্বাচনী সভা হয়ে গেছে। কংগ্রেসের একটাও হয়নি। গত নির্বাচনেও তো সি.পি. এম প্রার্থী এখান থেকে বিপুল ভোট পেয়েছিল এবং নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁকে জিতিয়ে তেমন কিছু লাভ হয়নি। তবে, মাছ চাষ, ডিপ টিউবয়েল, চুবড়ি বোনা, ট্রাক্টর প্রভৃতির জন্য লোন পেয়েছে অনেকেই। অবশ্য বেশীরভাগই ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে। সবগুলোই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়েছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা আপনি নিজের চোখেই দেখছেন। বর্ষাকালে রাস্তাঘাটের অবস্থা আরও খারাপ হয়।' সামনেই বসে থাকা আর একজন অল্প বয়েসি ছেলে মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'দাদা আমি ৬০০০ টাকার লোন চেয়েছিলাম জুতোর কারবারটা বড় করার জন্য কিন্তু আমাকে দেওয়া হলনা, কিন্তু বর্গাদাররা পেল। সিডিউল কাস্টদের অনেক বেশী সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বেড়িয়ে আসবার আগে শেষ প্রশ্ন করেছিলাম, গ্রামের ভেতরে কি বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, বা বিদ্যুতের বদলে কেরোসিনের তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। তার উত্তরে জানালে এখান থেকে ২০০ গজ ভেতরে ঢুকলেই আর বিদ্যুতের দেখা পাবেন না। আর কেরোসিন, এখানে তিনটে ডিলার থাকতেও কেরোসিনের একটা কৃত্রিম অভাব রয়েছেই।

প্রত্যেক জায়গাতেই পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে। যেমন জাঙ্গীপাড়াতে যে নতুন স্কুল হয়েছে যেটা সি.পি. এম পঞ্চায়েত থেকে দাবী করা হচ্ছে কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ তাঁদেরই। কিন্তু সম্পূর্ণটা নয়, আংশিক। কেননা স্কুলের জমি এবং বাড়ি তৈরীর সিংহভাগ টাকা পূর্বতন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি যোগাড় করেছিল।

দ্বিতীয়ত, জনাই, জাঙ্গীপাড়া, নবগ্রাম এবং কানাইপুরের পঞ্চায়েত অফিসগুলি বিপুল টাকা ব্যয় করে তৈরী হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধানদের উক্তিতেই একটা প্রচ্ছন্ন গর্বিত ভাব লক্ষ্য করেছি, 'দেখছেন তো আমাদের এই পঞ্চায়েত অফিসগুলো' পাকা করতে অনেকগুলো টাকা খরচা হয়ে গেছে। ফিরিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম–এ টাকাটা আপনারা কোথা থেকে পেলেন? কেন, চাষীদের যখন তিনমাস কাজ থাকেনা তখন তাঁদের দিয়ে আমরা করিয়েছি। তাতে তাঁদেরও কিছু রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

তৃতীয়ত, প্রাইমারী স্কুলগুলোতে দলীয় কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে অনেকেই ক্ষুব্ধ, এমনকি দলেরও কিছু ছেলে। যারা এখন পর্যন্ত কোন চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। খুব কাছের লোক ছাড়া কেউই চাকরি পাইনি। যে কারণে দ্বারকানাথ উচ্চবিদ্যালয়ে জাঙ্গীপাড়ায় এখনও কয়েকটি পদে লোক নিয়োগ বন্ধ রেখেছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি.পি. এমের অধিকাংশ দেওয়াল লিখন হয়েছে 'স্বজন পোষণ বন্ধ করতে হবে।' এই কি স্বজন পোষণ বন্ধের নমুনা?

শ্রীরামপুর কেন্দ্রটিকে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যার দুটি কেন্দ্র রয়েছে হাওড়া জেলায়। সে দুটি পাঁচলা ও জগৎবল্লভপুর। পাঁচলার এম. এল. এ কংগ্রেসের শেখ আনোয়ার আলি। এর আর এক পরিচয় কলকাতার মহমেডান ক্লাবের কর্মকর্তা। এইবার উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের লোকসভা প্রার্থী। এখানকার অঞ্চলটি মুসলমান অধ্যুষিত। কংগ্রেসের এখানে মোটামুটি কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল। জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিপ্রধান। পশ্চিমবাংলার পানের বোরোজ অধিকাংশই এই অঞ্চলে। এখানে আগের এম.এল. এ অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লকের ছিল। এলাকাটি ফ. ব. এর এক শক্ত ঘাঁটি। কথা হচ্ছিল এক পানের বোরোজের মালিক অবস্থাপন্ন পরিবার বলাই দাসের সঙ্গে। তার ভাইপো গঙ্গাধর পুরের পঞ্চায়েত প্রধান সি.পি. এম কর্মী। মুসলমান ভোট অধিকাংশই কংগ্রেসের দিকে যাবে। তাছাড়া এখানকার এম. এল. এ ও কংগ্রেসের কিন্তু পঞ্চায়েত সি.পি. এমর। বলাইবাবু এক কথায় জানিয়ে দিলেন দেখুন গ্রামের রাজনীতি কিরকম জানেন যে সুযোগ দেবে তাকেই ভোট দেবে আর কেউ যদি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সঙ্গে সঙ্গে সেটা অপরদিকে চলে যাবে।

জগৎবল্লভপুরে কংগ্রেসিদের একটা চাপা ক্ষোভ দেখলাম। তাদের কর্মীরা দেওয়াল লিখছে কে বা কারা সেগুলো মুছে দিচ্ছে। তারা এর বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে। যাকে দেখতে পাবে যে দেওয়াল মুছছে তাহলে তার আর রক্ষা নেই। প্রশ্ন করলাম এটা কি বিপক্ষ দলের কাজ বলে মনে করছেন। বলল, হ্যাঁ তারা ছাড়া কে করবে বলুন। এখানকার এম. এল. এ সি.পি. এমের হলেও, কংগ্রেসও সি.পি. এমের থেকে নির্বাচনী প্রচারে পিছিয়ে নেই। সমগ্র শ্রীরামপুর লোকসভায় এই দুটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস সি.পি. এমের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে পাল্লা দিয়ে চলছে। অন্যান্য জায়গায় যেমন কংগ্রেস কর্মীর সংখ্যা খুবই কম সে তুলনায় এ দুটি কেন্দ্রে কর্মীর সংখ্যা বেশ ভালই।

সমগ্র শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা। আসনের মধ্যে ছটি সি.পি. এমের দখলে এবং একটি কংগ্রেসের দখলে। '৮০ লোকসভা নির্বাচনের পর '৮৪ র নির্বাচনে প্রতি কেন্দ্রে ভোট সংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাত হাজারের মত। মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত। '৮০–র নির্বাচনে অজিত বাগ জিতেছিলেন ১,০৬,০০০ ভোটের ব্যবধানে। এই ব্যবধান '৮৪-তে বেশ কিছুটা কমবে বলে মনে হ'ল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথা বলে। আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, শেষপর্যন্ত তেমন কোন ব্যবধান না–ও থাকতে পারে হয়ত ১–১০০ সংখ্যার ভোট–ই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রটির ভাগ্য নির্ধারণ করল। তবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে হবেন, এ বিষয়ে জ্যোতিষগিরি না করাই ভালো। □

WITH

THE BEST COMPLIMENTS OF

Stewart & Co.

14, India Exchange Place

Calcutta—700 001

Phone No : 22-7196-97-98
23-8269

আই অ্যাম এ বাহাত্তুরে!

ইন্দ্রজিৎ

কথাগুলো ড: বিধানচন্দ্র রায়ের। মনে আছে একদা অনেকটা রেগে আগুন, তেড়ে বেগুন হয়েই বলেছিলেন কথাগুলো। বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যরা উত্যক্ত করছিলেন, তার জবাবেই তিক্তবিরক্ত বিধান ঐ কথাগুলো বলেছিলেন।

তখন বয়েসের, অভিজ্ঞতার, যেমন মূল্য দেওয়া হত, সেই রকম বক্রোক্তিও বর্ষিত হত। ক্যাটারাকট অপারেশনের জন্য ড: রায় জার্মানি গিয়েছিলেন। তার আগে পড়তে কষ্ট হত। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর আসন ছিল ট্রেজারি বেঞ্চের প্রথম সারিতে। ড: রায়ের চোখের ব্যামো ধরা পড়তেই সেটি সরে গেল একেবারে পিছনের সারিতে। স্পীকারের ডান দিকে। একটা টেবিল ল্যাম্প আনা হল। তার আলোর নিচে ফাইল রেখে ড: রায় ভাষণ দিতেও ঐ সময়ে 'কানা' অপবাদটাও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সব সময়ে ঠিকমত পড়তে পারতেন না। রামের জায়গায় শ্যাম হয়ে যেত। বিরোধীরা হেসে উঠতেন। একবার ড: রায় বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী নয়, আই অ্যাম এ মুখ্যমন্ত্রী এ বাহাত্তুরে! জ্যোতিবাবুও ইংরেজিতেই বলতেন।

এতদিনে সব–কিছুই পালটে গেছে। সেদিনকার বিরোধীপক্ষ এখন সরকার পক্ষ। দক্ষিণপন্থীরা এখন বামপন্থী। তবে স্পীকারের দক্ষিণ দিকের সদস্যদের আগে যেমন বয়েস বেশি ছিল এখনও সেই রকম। তার থেকে বরং বেশিই। তখন সরকার পক্ষের একমাত্র ড: রায়ই বলতে পারতেন, আই অ্যাম এ বাহাত্তুরে, এখনকার সরকার পক্ষে বিশেষ করে ট্রেজারি বেঞ্চে বাহাত্তুরে এবং প্রায় বাহাত্তুরেরাই মেজরিটি সেই সুবাদে শত্রু পক্ষ যদি অতীতের তরুণ যতীন চক্রবর্তীদের মতো বামফ্রন্টকে বার্ধক্যের বারানসী বলেন? জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জি, বিনয় চৌধুরী, কৃষ্ণপদ ঘোষ, প্রভাস রায়, মনোরঞ্জন রায়, যতীন চক্রবর্তী মাখন পাল, –আরও অনেকেই ড: রায়ের গোত্রে পড়ে গেছেন অথবা যাব–যাব করছেন। শুধু তাই নয়। এঁদের অনেকেই অনেকবার হাসপাতাল ঘুরে এসেছেন। কয়েকজন তো বিদেশ ঘুরে এসেছেন স্রেফ চিকিৎসার জন্য। বামফ্রন্টের যাঁকে দুরন্ত যৌবনের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত, সেই রাম চ্যাটার্জিও এখন বাহাত্তর ছুঁইছুঁই। বিনয় চৌধুরী অথবা যতীন চক্রবর্তী হয়তো ড: রায়ের মতোই কর্মঠ আছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়েসের শম্ভু ঘোষ অথবা বিমল বসু সম্পর্কে তেমন কথা বলা যায় কি?

নির্বাচনী দৌড়ে বয়েস যদি কোন ফ্যাকটর হয়, আগে সেটা ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এখন কিন্তু পক্ষে। সোমেন–সুব্রত–প্রিয়–সৌগত–নুরুলদের বাদ দিন, প্রণববাবুই এখনও ৫০–এ পৌঁছন নি। বরকত সাহেব খুব বেশি দূরে নেই। বয়েস বেশি যাঁর সেই অশোক সেনই যতীনবাবু–বিনয়বাবুদের তুলনায় এখনও দ্রুত ছুটতে পারেন। আকাশে ওড়া আর গাড়িতে ছোটা তাঁর নিত্যকার কাজ। নিত্য ভাষণ দেওয়াটা তাঁর পেশার একটি অংগ। হাঁপিয়ে উঠবার হেতু নেই।

কংগ্রেস আদি আর নবতে বিভক্ত হবার পর নব কংগ্রেসে অনেক বেনোজল ঢুকে পড়ে। এখন তার একটি অংশ দলের প্রথম সারি আলো করে রেখেছেন। নির্বাচনের আসল কাজগুলো প্রথম সারির নেতাদের করতে হয় না। তার জন্য যে মুড়ি–মিছরির দরকার তার ঘাটতি কোন পক্ষেই নেই। তাছাড়া এমন অনেক কাজ আছে যার জন্য ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। হালফিল দেখা গেছে দেয়াল লিখন, পোস্টার সাঁটা, ব্যানার লাগানো প্রভৃতি কাজে উভয় পক্ষের স্কোর প্রায় সমান সমান। মঞ্চ, তোরণ প্রভৃতির দায়িত্ব যেন ডেকরেটর–রাই। তাঁরা সকলের জন্য। ডাকলেই হাজির। সংগীত শিল্পী, নাট্য গোষ্ঠী–এসবেরও ঘাটতি নেই। এখন অর্থের অভাবও নেই কোন পক্ষেরই। অভাব নেই গাড়ি–ঘোড়ারও।

উভয় পক্ষই তৈরি। সকল ব্যাপারেই প্রস্তুত। মুশকিল হয়েছে সাধারণ মানুষদের নিয়ে। সেই যাঁরা ভোট দেন। জনসভায় আজ তাঁরা আসতেই চান না। কলকাতায় এখন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় কিংবা ঐ ধরনের মানুষ– জমে–থাকা জংশনগুলো–তেই জনসভা হচ্ছে। এমনকি ইন্দিরা স্মরণসভাও। দুপক্ষেরই এই ব্যাপারে মিল আছে। পার্কে, শহীদ মিনারে–এমন কি হলেও কেউ মিটিং ডাকেন না। জনসভা নয়, এখন সকল পক্ষই ছুটছেন পথসভা, মোড়সভা, জংশন সভার দিকে। উদ্দেশ্যে ভাসমান জনস্রোতে দলের আইডিয়াগুলো ইনজেকট করা।

জনসভা হলে যে হুজ্জুত পোহাতে হয়, কোন পক্ষই তাতে রাজি নন। লরি না হলে শ্রোতা আনা যায় না। অত লরি জোগাতে হলে পার্টি লাটে উঠে যাবে। মনে হয় এবার জনসভা হবে নামমাত্রই। তার বদলে পথে–ঘাটে ছোট ছোট–সভাই হবে বেশি। এসভাগুলোতেও তেমন বক্তা চাই যাঁর আকর্ষণ আছে। এই ব্যাপারে কংগ্রেস কিন্তু এগিয়ে আছে। অশোক সেন, প্রণববাবু কিংবা বরকত সাহেব পথসভায় আগেই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। জ্যোতিবাবু বিনয়বাবু, সরোজ বাবুরা কি পথে নামতে পারবেন? □

ব্যারাকপুর কেন্দ্র

বিধান সভা কেন্দ্রঃ

(১) বিজপুর, (২) নৈহাটি, (৩) জগদ্দল (৪) ভাটপাড়া, (৫) কাঁচড়াপাড়া, (৬) টিটাগড়, (৭) আমডাঙা

টিটাগড় বাদে অন্য কেন্দ্রে সি. পি. এম. প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে টিটাগড়ে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পরিবহন মন্ত্রি মহঃ আমিন মাত্র ১৩২ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী গঙ্গা প্রসাদ সাউয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

মহঃ আমিন বর্তমানে নির্বাচন প্রার্থী। মহঃ ইসমাইলকে এবারের নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়নি। কংগ্রেস প্রার্থী দেবী ঘোষাল, যিনি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ভাটপাড়া কেন্দ্রে সি. পি. এম. প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ৮০-র লোকসভা নির্বাচনেও শ্রী ঘোষাল কংগ্রেস প্রার্থীরূপে সি. পি. এম. এর কাছে প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

রবি দাস

আমডাঙা বাদে অন্য ৬ টি কেন্দ্রের ৫০ ভাগ ভোটদাতাই শ্রমিক। বাকি ৫০ ভাগ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি। আমডাঙা কৃষক অধ্যুষিত এলাকা।

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। বিগত নির্বাচনের তুলনায় এবার ভোট বেড়েছে প্রায় ১ লক্ষের কিছু বেশী। সি. পি. এম. নেতা যামিনী সাহার দাবী শ্রমিক ভোটের ৭০%-ই তাঁরা পাবেন। কৃষক ভোটের সংখ্যা প্রায় ১২৮০০০। এছাড়াও এই কেন্দ্রে রয়েছে মুসলিম তেলেগু শিখ হিন্দু বাঙালী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভোট।

সি. পি. এম. ও কংগ্রেস ছাড়া আরও তিনজন প্রার্থী আছেন এই কেন্দ্রে। নক্সালপন্হি বি. জে. পি. রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি (রাজনারায়ণ পন্হি)। নক্সাল প্রার্থী নরেশ সরকার বছর দেড়েক আগে সি. পি. এম. থেকে বেরিয়ে আসেন। তাই তিনি বিক্ষুব্ধ সি. পি. এম. বলেও পরিচিত।

প্রচার ও সংগঠন

সি. পি. এম. -এর প্রচার খুব জোরদার। এলাকার ৮০ ভাগ দেওয়ালই তাদের দখলে। ছবি ও লেখায় দেওয়ালগুলি ইতিমধ্যেই রাঙিয়ে উঠেছে পাকা শিল্পীর তুলিতে। এলাকায় এলাকায় পার্টি কর্মী ও সমর্থকরা G/B মিটিং করছেন। জন-সাধারণকে নিয়ে প্রতিটি এলাকায় Group মিটিংও করছেন তাঁরা। এছাড়া মিছিল জনসভা তো আছেই। যামিনী সাহা (M. L. A) জানালেন প্রতি কেন্দ্রে তারা ২০০০ কর্মী নিয়োগ করছেন।

সি. পি. এম-এর পার্টি কর্মীরা দুদিনের মাইনে দিচ্ছেন। শ্রমিকদের থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে। বিশাল শিল্পাঞ্চলের বড় বড় কারখানার সব কটিতেই C. I. T. U ইউনিয়ন আছে। বেশ কিছু কারখানায় C. I. T. U -ই প্রধান ইউনিয়ন।

প্রচার ও সংগঠনে কংগ্রেস এখনও অনেক পেছিয়ে। দেওয়ালে চুন লাগান হলেও এখনও লেখা হয়নি অনেক দেওয়ালই। মিটিং মিছিল তেমন চোখে পড়েনা।

এবারে কংগ্রেস প্রার্থী, মুসলীম ভোট বেশী পাবে। গঙ্গা সাউয়ের কাছেই আমিন সাহেব বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন। শ্রমিক এলাকায় তেলেগু ভোটের সংখ্যাও অনেক। কংগ্রেসের আশা তেলেগু ভোটের বেশীর ভাগই তারা পাবেন। শিখ ভোট অত্যন্ত কম। দাঙ্গার সময় কংগ্রেস এদের সাহায্য করেছে তাই তাদের ধারনা এই ভোটের সবটাই সি. পি. এম. এর বিরুদ্ধে যাবে। সি. পি. এম. প্রার্থী মুসলিম হওয়ায় হিন্দুস্থানী ভোটের অনেক গুলি যাবে কংগ্রেসের পক্ষে। হিন্দুস্থানী ভোটারদের ৯০% ভোটই শ্রমিকদের। মুসলিম ভোটারের সংখ্যা ৮৫০০০। রাজনৈতিক সচেতন বাঙালী ভোট, মুসলিম ভোট এবং কৃষক এলাকার বেশীর ভাগ ভোটই সি. পি. এম. -এর পক্ষে যাবে বলে মনে হয়।

বি. জে. পি. ও রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি ও নকসালপন্হি প্রার্থীদের প্রচার এখনও তেমন জোরদার হয় নি।

টিটাগড়ের কংগ্রেস M. L. A. গঙ্গা সাউয়ের মতে আমিন সাহেব মুসলিম হলেও এবারে টিটাগড় কেন্দ্রের মুসলিম ভোটের একটা ভাল অংশই কংগ্রেস পাবে। কারণ হিসাবে তিনি বল্লেন– আমিন সাহেব রাজ্যের মন্ত্রী হয়েও এই এলাকার মুসলিমদের জন্য বিশেষ কিছুই করেন নি। অথচ তিনি M. L. A. হবার পর হিন্দু হয়েও তাদের উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। তাদের যে কোন প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ মুসলিমদের সাথে এখন অনেক বেশী। এবং এই ব্যক্তিগত প্রভাবেই

সি. পি. এম. -এর এবারের প্রচারে জোর পেয়েছে – বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা-বাদ বিরোধী ও জাতীয় ঐক্য রক্ষার স্লোগান। এ ব্যাপারে কংগ্রেসকেই তারা দায়ী করছে। মজার ব্যাপার কংগ্রেসেরও প্রধান নির্বাচনী প্রচার এটাই। সি. পি. এম. তাদের প্রচারে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও এই রাজ্যের বঞ্চনার চিত্রও তুলে ধরেছে। □

জলপাইগুড়ি – অন্তর্দ্বন্দ্ব চেপে রেখে নির্বাচনে নেমেছে কংগ্রেস (ই) ও সি পি আই (এম)

প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে সি পি আই (এম) কংগ্রেস দু-দলের ভেতরই ফাটাফাটি হয়ে গেছে। বর্তমান সদস্য এবং সি পি আই (এম)-এর জেলাসম্পাদক সুবোধ সেন এবারও দলের মনোনয়ন পাবেন প্রথম থেকে এরকমই ঠিক ছিল। বামফ্রন্ট ও সি পি আই (এম) দলের প্রার্থী তালিকাতে তাঁর নাম ছিল। সরোজ মুখার্জী এখানে এসে তা ঘোষণাও করে গিয়েছিলেন। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দিয়ে মানিক সান্যালকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। দলে এ নিয়ে মতবিরোধ চাপা থাকেনি। অনেকটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা গোটাটাই প্রকাশ্য। এখানে কংগ্রেস প্রার্থী পদের দাবীদার ছিলেন দলের জেলাসভাপতি ডঃ অনুপম সেন। অনুপমবাবু ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড জনপ্রিয়, গত বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ফঃ ব্লকের মন্ত্রী নির্মল বসুর কাছে মাত্র একহাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁকে বাদদিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয় অরুণ মৈত্রকে। অরুণবাবু কিছুদিন আগেও কংগ্রেস (আর্স)এ ছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রথেকে দলের হয়ে দাঁড়িয়ে আট হাজার ভোট পেয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের প্রচার তুলনামূলক-ভাবে ভাল হলেও এই কারণেই এখানে তাদের প্রচার আরম্ভ হয়েছে অনেক পরে। সি পি এম এর অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। সাধারণ মানুষের অভিমতও তাই। সামগ্রিকভাবে প্রথম দিককার নিস্তেজ, গা ছাড়া ভাবটকাটিয়ে এখানের নির্বাচনী পালে হাওয়া লেগেছে অনেক পরে।

অরুণ মৈত্র পোড়খাওয়া, কুশলী রাজনীতিক। তাঁর প্রার্থীপদ সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের সবাইকে খুশী করতে পারে নি, তিনি জানেন। তবে ডাঃ সেনের মতে, 'আমরা মেনে নিয়েছি। অরুণবাবু সেইজন্য সবাইকে সঙ্গে পেতে চাইছেন। নির্বাচনে দাঁড়ান এই তার প্রথম নয়। ঘাঁতঘোঁতগুলো ভালই জানেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সি পি এম প্রার্থী মানিক সান্যাল একেবারেই নতুন। এই প্রথম নির্বাচন প্রার্থী। বয়স ৫০ হলেও চেহারায় ও কাজে এখনও স্বচ্ছন্দ তরুণ। গণসংগঠনের ভালো অভিজ্ঞতা থাকলেও নির্বাচনী যুদ্ধের কলাকৌশলের সব কিছু জানা নেই। জলপাইগুড়িতে এবার লড়াই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনভিজ্ঞতার।

এই কেন্দ্রের গত লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের উল্লসিত হওয়ার মত কোন কারণ ঘটেনি। একটি আসনও তাদের দখলে নেই। অবশ্য কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে

অঞ্জন সিকদার

ভালসংখ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিন্তু কংগ্রেস বামফ্রন্টের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত ভাল ফল করেছে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই। এর জন্য যেমন কংগ্রেসের সংগঠন কিছুটা কৃতিত্ব দাবী করতে পারে সেইরকমই বাম শরিকদের পরস্পরের মধ্যে লড়াইও এই ফলাফলের জন্য দায়ী।

জলপাইগুড়িতে শিক্ষিতের হার আস্তে আস্তে বাড়ছে। এবং যত বাড়ছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সি পি এমের প্রভাব তত কমছে। কলেজগুলির ছাত্রসংসদের অনেকগুলিই ছাত্র পরিষদের দখলে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সমর্থন কংগ্রেস পাবে।

ইন্দিরা হত্যার পরে এখানে স্বতঃস্ফূর্ত শোকপ্রকাশ হয়েছে। ভোটে তার কিছুটা প্রভাব পড়বে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। গ্রামে গঞ্জে প্রধান বিষয় হবে ধান, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, অত্যাচার আর ভোটের আগে খয়রাতি সাহায্য। এই অঞ্চলে যে সব চা-বাগান আছে তার ভোটের বেশিটাই নিয়ন্ত্রণ করবে পয়সা।

কিন্তু এসব কিছুর ওপরে সি পি আই এম-কে যা ভাবাবে তা অন্য। বরকত-জুর তাদের তাড়া করে ফিরছে। কয়েকমাস আগে এখানে এক মিটিংয়ে অরুণ মৈত্র গণিখানকে দার্জিলিং মেলকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসা, জলপাইগুড়ি স্টেশনের সংস্কার ও স্টেশন সংলগ্ন একটি সুপার মার্কেটের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বরকত এক মাসের মধ্যে দার্জিলিং মেলকে জলপাইগুড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন, স্টেশনের কাজ আরম্ভ হয়েছে আর সুপার মার্কেটের জন্য কাজ শুরু হওয়ার পথে। এছাড়াও এই অঞ্চলের সঙ্গে ডুয়ার্স এলাকার সংযোগসাধনের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্থনীতির চেহারা বদলে যাবে। বরকত গণিখান তেড়ে ফুঁড়ে আসরে নামলে সি পি আই এম কে জেতার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

ভোটার লিস্ট নিয়ে কংগ্রেসের ভুরি ভুরি অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে অনুপমবাবুর বক্তব্য, 'বুথ পিছু গড়ে ১০০-১৫০ জন কম বয়সীদের নাম সি পি আই এম ভোটার লিস্টে ঢুকিয়েছে। তার আশংকা 'বুথ জ্যাম' নিয়েও। সি পি আই এমের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, 'এর কোন ভিত্তি নেই'।

এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে তিনটি আর এস পি ও ফঃ ব্লকের দখলে। সি পি আই এমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে দল দুটি লড়েছিল। শরিকী সংঘর্ষও কম নয়। কোচবিহার পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাই-গুড়িতে ফঃ ব্লক ও আর এস পির সঙ্গে সি পি আই এমের লড়াই ও খুনোখুনীজনিত প্রভাব এই কেন্দ্রেও সি পি আই এম কে চিন্তিত করতে পারে।

তবুও সি পি এমের অবস্থা এখনও তুলনামূলকভাবে ভাল। কংগ্রেসের ভোট যথেষ্ট বাড়বে এবং বাড়ানোর মত হাওয়াও তারা পাবে। এই হাওয়াটা যদি কংগ্রেস সবার মধ্যে সংক্রামিত করতে পারে তাহলে তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনিশ্চিত ফলাফলের সম্ভাবনা আছে। □

শেষমুহূর্তের নির্বাচনী হাওয়াই ভোলা সেনকে জেতাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এক অংশের মত হল নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঝটিকা সফরে যে বিপুল পরিমাণ ভোট এধার ওধার করে দিতেন নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীবের পক্ষে তেমনটি করা সম্ভব নয়। অন্য দল মনে করে, রাজীবের রাজনৈতিক পারদর্শিতা বিষয়ে বিতর্কে না নিয়েও, কেবল ইন্দিরা হত্যা জনিত সেন্টিমেন্টের প্রভাবকে উসকে দিয়েই রাজীব একাজ অতি ভয়ঙ্কর দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। এবং বিরোধীদের ধরাশায়ী হবার জন্য, শেষ বেলায় এইসব উপর্যপুরি বাউন্সার ছোড়া ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস (আই)।

নির্বাচন ঘোষণার শুরুতে কংগ্রেস (আই) যেভাবে পিছিয়ে পড়েছিল দেওয়াল দখল আর পোস্টার যুদ্ধে, অনেকেই বলতে শুরু করেছিল বামদল গুলো এবারে গোল করবে ফাঁকা মাঠে। অত্যন্ত ধীর অথচ নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে নির্বাচনের ঠিক দশদিন আগে মানুষ-জনের পূর্ব ধারণা কিন্তু পাল্টে দিতে শুরু করেছে কংগ্রেস (আই)। এবং অবশ্যই পোস্টার যুদ্ধে, বিজ্ঞাপনে ও তার বৈচিত্রে কংগ্রেস (আই) অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছে সি. পি. আই. (এম)কে। কিছু কিছু পোস্টারে, ছবি ও বর্ণনা সহ শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তা এই দেশের অতি সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে বাধ্য। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে রাজীব গান্ধীর কলকাতা সফর তখন শেষ। মায়ের হাত থেকে সম্মোহনের যাদু দন্ডটিও তিনি পেয়েছেন কি না আমরা জানিনা, কিন্তু তাঁর এই পরিচয় মানুষের মনে অত্যন্ত রগরগে যে, তিনি এমন একজন তরুণ যাঁর মা'কে ভয়ঙ্কর ভাবে হত্যা করা হয়েছে। ম্যাজিক এখানেই।

ক'লকাতার তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার লড়াই হবে সব থেকে জোরাল। উত্তরের তুলনায় দক্ষিণ অনেক ছড়ান। এখানে এখন প্রতিটি আড্ডায় কলেজ গুলোতে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবিষ্যৎবাণীর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এক মাস আগেও মনে হচ্ছিল কংগ্রেস সত্যসাধন চক্রবর্তীকে ওয়াক ওভার দিয়েছে। এবং সত্যি এরকম ঘটনা পশ্চিমবাংলা বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ঘটেছে। দলাদলির এই প্রকাশ্য চেহারায় অনেক কংগ্রেস সমর্থকই বিভ্রান্ত ও বিরক্ত। বিশেষ করে বর্ধমান সম্পর্কে এই কথা অনেক বেশি সত্যি। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় যে তেমনটি ঘটেনি তা বুঝতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। প্রথম থেকেই সি. পি. আই(এম) পোস্টার ও দেওয়ালের যুদ্ধে অনেক এগিয়েছিল এখানে। গতবারের বিজয়ী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী এবারেও প্রার্থী। ভাল বলিয়ে-কইয়ে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা মিটিং জমিয়ে রাখতে অত্যন্ত পারদর্শী সত্যসাধন ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বড় মিটিং এই আঞ্চলে করে ফেলেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী ভোলানাথ সেন কিছু বড় মিটিং করলেও জোর দিয়েছেন প্রধানত পদযাত্রা এবং স্ট্রীট কর্ণারের উপর। ভোলা সেনকে এই প্রসঙ্গে

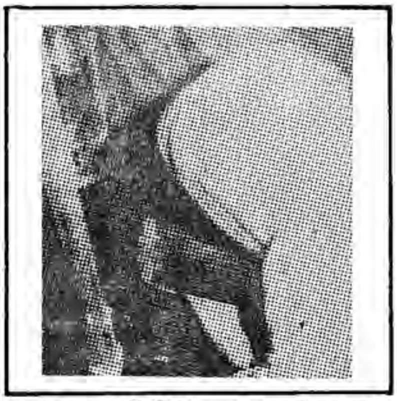

প্রশ্ন করতে তিনি জানালেন, তাঁর ধারণা হল, কলকাতায় ভোটাররা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তাঁরা কোন প্রার্থীকে ভোট দেবেন। এছাড়া এই হাজার সমস্যা জড়িত কলকাতার মানুষ-জন বড় মিটিং খুব একটা পছন্দ করছেন না। ফলে এখানে সেখানে বড় বড় মিটিং করে লোক জড় করে এই নির্বাচনে খুব একটা কিছু হবে বলে ভোলা সেন মনে করেন না। তার পরিবর্তে তিনি দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন ভোটারদের সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে। পাড়ায় পাড়ায় পদযাত্রা করতে।

যে সাতটি বিধানসভা নিয়ে এই কেন্দ্র তার ভেতর গত ১৯৮২-র বিধানসভা নির্বাচনে চৌরঙ্গী আলিপুর রাসবিহারী কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়ী হন। বাকী চারটিতে জয়ী হন সি. পি. আই. (এম) প্রার্থীরা। কলকাতার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের ভেতর এই কেন্দ্রেই ভোটার সংখ্যা সব থেকে বেশি এবং প্রকৃত অর্থে কসমোপলিটান। এই নির্বাচনে অবাঙালী ভোট কংগ্রেসের দিকে না যাবার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া কলকাতাবাসী ২৫,০০০ পাঞ্জাবী জনতার বেশির ভাগই দক্ষিণের বাসিন্দা। কত কয়েকমাসের ঘটনা এবং প্রধানত দাঙ্গাই তাঁদের কংগ্রেস বিরোধী করে তুলেছে। কংগ্রেসের এটা এক বিরাট ক্ষতি। ক্ষসক্ষতির এই ফসল পুরোটাই ঘরে তুলবে বামপন্থীরা। এর ফলে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোট বামফ্রন্টের বাড়বে। কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষে সব থেকে বড় সুবিধে হল এইবার কংগ্রেস ভোট ভাগ হবে না। অবামপন্থী সমস্ত ভোটই যাবে ভোলাসেনের পক্ষে। গত লোকসভা নির্বাচনে প্রিয়রঞ্জন এবং জনতাপ্রার্থী দিলীপ চক্রবর্তী যদি অ-বাম ভোট না টেনে নিতেন তবে ভোট পাওয়ার হিসেব থেকে দেখা যায়, গতবারই সত্যসাধনত পরাজিত হতেন ভোলাসেনের কাছে। গত নির্বাচনে সত্যসাধন চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট ছিল ২,১৩,৪৪১ আর ভোলা নাথ সেন, প্রিয় রঞ্জন এবং দিলীপ চক্রবর্তী একসঙ্গে পেয়েছিলেন ২,৩৭,৬৮৩, অর্থাৎ আরও পাঁচ হাজার অবাঙালী ভোট পেলেও ভোলা সেনের জয় সুনিশ্চিত। এছাড়া আছে এক বিরাট অংশ দোদুল্যমান জনতার, যাঁরা বামফ্রন্টের থেকে কংগ্রেসের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, দৈনন্দিন সমস্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ রাস্তায় জল জমা, ভাঙা পথ-ঘাট, পানীয় জল, আলো এসব সমাধানের ক্ষেত্রে, বামফ্রন্টকে পুরোপুরি ব্যর্থ মনে করেন এক বিরাট অংশ জনতা। নির্বাচনে এর ছাপ পড়তে বাধ্য। যদিও ঐ একই সমীক্ষার ফল অনুসারে একমাত্র আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেই বামফ্রন্ট সরকারকে তাঁরা যোগ্য সম্মান দিতে প্রস্তুত।

এইসব কিছু ছাড়াও নির্বাচনের ঠিক পূর্বের সাত দিনের কংগ্রেসের প্রচার বিজ্ঞাপন, প্রধানমন্ত্রীর সফর আরও বেশি কিছু ভোট কংগ্রেসের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই। □

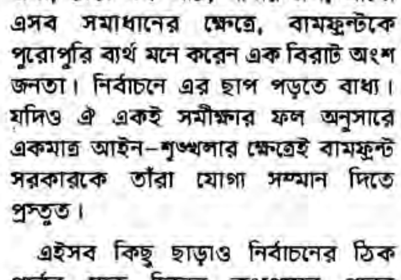

জয় নিয়ে অশোক সেনের কোন দ্বিতীয় ভাবনা নেই

উত্তর পশ্চিম কলকাতা কেন্দ্রে অশোক সেন হারবেন, এ কথা বামফ্রন্টের কোন গোঁড়া সমর্থককেও বলতে শোনা যাচ্ছে না। ট্যানারী অঞ্চলের ব্যাপক অবাঙালি হরিজন ভোটই অশোকবাবুর জয়ের চাবি-কাঠি। অশোকবাবু নিশ্চিত, এবারেও তিনি জিতছেন। আমাদের প্রতিনিধি আগামী লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে তাঁর এই সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন।

অনুপ সরকার

□ দিল্লিতে রাজীবজির সঙ্গে আপনার কি কথা হল?

□ অনেক কথা। সব কথাতো বলা যাবে না। তাকে বলেছি এবার পশ্চিমবঙ্গে আমরা ভাল ফল করবো। কারণ, জনগণ কে আমাদের কথা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি। আমরা জনগণের সঙ্গে সব সময় রয়েছি। অন্যদিকে প্রধান প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট আমাদের চেয়ে অনেক নিষ্ক্রিয়। এ রাজ্যের মানুষ ওদের ধাপ্পাবাজি বুঝতে পেরেছে....।

□ আপনারা কি নিশ্চিত এবার পশ্চিমবঙ্গে আগের চেয়ে ভাল ফল করবেন? জনগণ খুনী কংগ্রেসীদের ভোট দেবেন কেন?

□ কে বলল আমরা খুনী?

□ কেন, দেওয়ালে, দেওয়ালে বামফ্রন্ট লিখছে? নির্বাচনী প্রচারে বলে বেড়াচ্ছে?

□ আমাদের অতীত, বর্তমান কি তাই বলে? ইন্দিরা হত্যার পর ভারতবর্ষ যে সংকটের মধ্যে পড়ে ছিল, এই কংগ্রেসই তো শক্ত হাতে তার মোকাবিলা করেছে। তা না হলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যেত। সারা বিশ্ব স্বীকার করছে বামফ্রন্ট না হয় বলছে, বলুক না! তাতে কি এসে যায়।

□ জ্যোতিবাবু এ রাজ্যের জনগণকে বলছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসকে মুছে দিন'। আপনারা কি বলেন?

□ আমরা আর কি বলবো। বাক্ স্বাধীনতাই বলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র আছে, বলছে বলুক। শেষপর্যন্ত দেখবেন ওরা না মুছে যায়।

□ এবার আপনারা পশ্চিমবঙ্গে কটা আসন আশা করছেন?

□ আমি জ্যোতিষ নই! বলতে পারি ভাল হবে।

□ কি করে বুঝলেন পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফল করবেন?

□ এতো সহজ ব্যাপার! বামফ্রন্টের গত ৭-৮ বছরের ভ্রান্ত নীতি, দুর্নীতি, অত্যাচার, কংগ্রেসী নেতাদের খুন, নিরাপত্তার অভাব, বেকারী, উৎপাদন হ্রাস এ'সব কারণে জনগণ থেকে ওরা অনেক দূরে চলে গেছেন।

□ যদি এবার কংগ্রেস আগের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে লোকসভায় আসন বেশি পায়, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে খারিজ করতে কি আপনারা দিল্লিকে সুপারিশ করবেন?

□ এমন কথা আমরা বলিনা, বলিনি। এসব বামপন্থীদের কথা। ওরা এখনই আমাদের ভয়ে ভীত তাই আগে থেকে এত ত্রাহি, ত্রাহি রব তুলেছেন ওঁরা।

□ এ রাজ্যে শিখ ভোটারদের সম্পর্কে আপনাদের ভূমিকা কি?

□ বন্ধুত্বের! আমরা বিশ্বাস করি শিখরা খালিস্তানীতে বিশ্বাসী নয়।

□ বামপন্থীরা বলছেন কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার হতে চলেছে, আপনার কি মনে হয়?

□ আমার এটাই মনে হয় যে ওরা আমাদের চেয়ে বেশি জানে, বেশি বোঝে। তাই আগে থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারছে। এখন কি ওরা জ্যোতিষ চর্চা শুরু করেছে নাকি?

□ প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটির তালিকায় প্রথমে আনন্দ গোপাল মুখার্জীকে চেয়ারম্যান করা হয়। পরে আপনাকে, কি করে সম্ভব?

□ কে বলেছে? যা শুনেছেন ভুল শুনেছেন। এমন কোন ঘটনার কথা আমার জানা নেই।

□ একটি বিশেষ সাক্ষাতকারে 'শনিবারের চিঠিতে' পরোক্ষভাবে আনন্দবাবু কিন্তু এ ঘটনাকে অস্বীকার করেননি?

□ ('শনিবারের চিঠি' খুলে) আনন্দ বাবু বুঝতে হয়তো ভুল করেছেন। বরাবরই আমি প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান। আনন্দবাবু আহ্বায়ক। এতো নতুন কিছু নয়।

□ কংগ্রেস পার্টিতে এত গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কেন?

□ এগুলো আপনাদের ভুল কথা। কোথাও দেখাতে পারবেন কোন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী প্রার্থী হয়েছেন? গুজবে কান দেবেন না। তবে এত বড় পার্টি। একটু আধটু ভুল বোঝাবুঝি থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। আসলে কি জানেন সবাই ভাবে আমি খাঁটি কংগ্রেসী।

□ শুনেছি এবার পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচন, গণিখানের সুপারিশে হয়েছে?

□ কার সুপারিশে হয়েছে বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রথমে প্রার্থীদের নাম আমি নির্বাচন করে পাঠাই। তার মধ্যে দশ-বার জনকে আমার অনুপস্থিতিতে এদিক-ওদিক করা হয়েছে।

অশোকবাবুরই পাশে বসে থাকা কয়েকজন সহকর্মী এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন। আসলে ঠিক তা নয়। সেন্ট্রাল পার্লামেন্টা ভোটেই সর্ব সম্মত ভাবে সমস্ত প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হয়েছে। অশোকবাবুও এ কথায় সায় দেন।

□ এরাজ্যে বামফ্রন্টের ফারুক আবদুল্লাকে আনবার উদ্দেশ্য কি?

□ (অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে, ওরাই জানেন ওদের উদ্দেশ্য কি! আসতে দিন, আসুক। ওসব ফারুককে কোন কাজ হবে না। জ্যোতিবাবু মুখে যতই বলুন। খুব ভাল ভাবেই জানেন আমরা আবার আসছি।

□ আমার শেষ প্রশ্ন। ভারতবর্ষে এখন রাজনৈতিক ট্রেন্ড কোনদিকে?

□ (বিরক্ত হয়ে) এখন বলার একদম সময় নেই। কি করে বলবো, যেমন চলছে, চলবে।

অশোকবাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে ঘর থেকে পা বাড়াতে উপস্থিত একজন সহকর্মী আমাকে সহাস্য বদনে বললেন, আমরা অশোকদা-কে এ রাজ্যে চাই। চাইলেই কি পাওয়া যায়? অশোকবাবু স্মিত হেসে বললেন, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়। লিখতে ভুল করবেন না। তবে কার কথা? জনগণের? □

প্রাক্ নির্বাচন সমীক্ষা: আসানসোল

হিন্দুস্থান পিলকিংটনের ৩২ জন শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলবে

সুতীর্থ রায়

১৯৮০ সালের ২৫শে মে থেকে আসানসোলের হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস অবরুদ্ধ দুর্গে পরিণত হয়েছে। চারপাশে, গেটের সামনে ১৩৭৮ জন শ্রমজীবী মানুষের হাত আছড়ে পড়ে, তারা কাজ করতে চায়। ভিতরে ঢুকতে চায়। কেননা, ঐ চার দেওয়ালের মধ্যেই আছে ওদের প্রাণ-ভ্রমর। শূন্য পাকস্থলীর জারক-রস নিবৃত্তির উপায়। ভাত-রুটি। কিন্তু দুর্গের কঠিন দরজা খোলে না, ভিতরে বাইরে বন্দুক হাতে পুলিশ। যেন ঐ দুর্গেই পাহারাদার সৈন্য – সব, যাদের প্রত্যেকের দিনের বেতন ষাট টাকা।

১৯৮০-র মে থেকে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। গতবারের নির্বাচিত এম পি কংগ্রেসের আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা ঐ মৃত্যুকে ক্যাপিটালাইজ করে এবার নির্বাচনে লড়ব।' উত্তরে সি পি এমের রবীন সেন বলেছেন, 'ঐসব মৃত্যুতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমরাই জিতব।' এই দুই ভিন্ন বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট যে, দুটি পার্টিই ঐ ৩২টি মৃত্যুকে মূলধন করে ছোটাতে চায় তাদের নির্বাচন-বাণিজ্যের রথ।

ইসকোর এক গৃহবধূ রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। কিন্তু ইন্দিরার মৃত্যুতে যখন দেশ উত্তাল, সেই সময় – তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়েও এই মৃত ৩২ জন শ্রমিক সম্পর্কে তিনি প্রায় অজ্ঞ। শুনেছেন মাত্র, কিন্তু আলোড়িত হন নি। মৃত্যুর ঘটনা ঐ সমস্ত শ্রমিকদের কিছু কাছের মানুষের মধ্যে ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। কেননা, ঐ সমস্ত মানুষেরা ইন্দিরা গান্ধী বা উত্তমকুমার নয়, সংবাদ মাধ্যমগুলিও তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে নি। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নেই কোন চিত্ত-চাঞ্চল্য। চারিয়ে যায় না দায়িত্ব বোধের কোন শিকড়।

খিদেয় পিত্তপড়া পাকস্থলীর রস ক্রমাগত হজম করে নিচ্ছিল এক একটা মানুষের শরীর। রক্ত-মাংস। এবং সেই অনিবার্য মৃত্যুর মতো জারক রসকেই যেন শুকিয়ে নেওয়ার জন্য রৌদ্রে পিঠ রেখে ওরা কয়েকজন বসেছিল। নবকুমার রায় চিতাবাঘের মতো সামনের দিকে ঝুঁকে হাতের ওপর ভর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। চোয়ালে দৃঢ়তা, যদিও তার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে শরীরের চামড়া হয়ে পড়েছে শ্লথ। নির্জীব। সাদা পাউডার ছড়িয়ে আছে মুখে, সারা শরীরে।

চিতার মতো তীক্ষ্ণ চোখ তুলে বলল, 'খবরের কাগজ? কি হবে লিখে?'

আমরা হেসে বললাম, 'কি হবে জানি না – তবে আমরা চেষ্টা করছি যদি আপনাদের অবস্থার কথা লিখে কারখানা খোলান যায়। জানি না পারবকিনা – তবুও জানবেন আমরা আপনাদের বন্ধু লোক।'

নবকুমারের মুখের কাঠিন্য অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। অন্যান্য যারা বসেছিল, তাদের দিকে তাকাল। প্রত্যেকের চোখেই তীক্ষ্ণতা। নবকুমার তেমনি দৃঢ় স্বরে বলে, 'ডিসেম্বরে খোলার কথা হচ্ছে। যদি না খোলে, কোন নেতাকেই আর বিশ্বাস করব না। মানুষ হয়ে মানুষ মেরে খেতে হবে। অন্য কোন উপায় থাকবে না।'

বললাম, 'এখানে বেশ কয়েকজন শ্রমিক মারা গেছে। তাদের কয়েকজন আত্মহত্যাও করেছে। কথাটা কি ঠিক?'

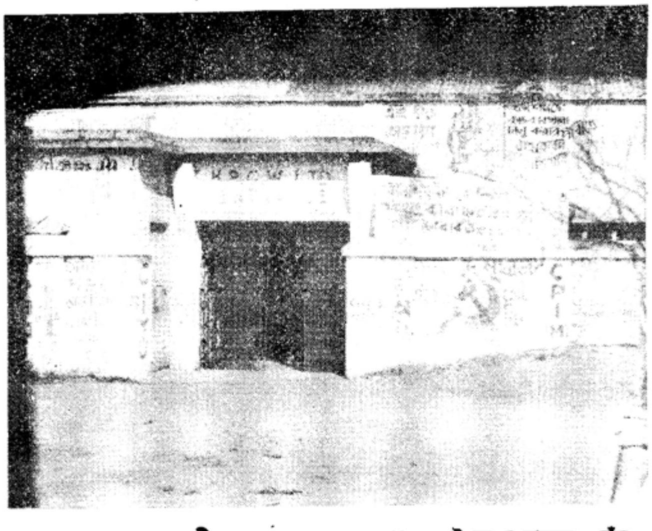

অনেকেই মাথা নাড়ল – হ্যাঁ। না খেতে পেয়ে, পরিবারকে না খাওয়াতে পেরে আত্মহত্যা করেছে।

'আশেপাশে সেরকম কোন বাড়ি আছে?'

নবকুমার বলল, 'আসুন।' ক্ষয়া পাঁচীলের ওপর রন্দুর ভেঙে পড়েছে। লাল ইট নোনা ধরেছে, চারপাশে ন্যাড়া – শুকনো আগাছা। কয়লার ডিপো। উদোম শিশু। খাটালের পাশে টিউব-অয়েল। দুপাশে হলুদ এটো ছিটিয়ে এক শীর্ণ মহিলা বাসন মাজছিল। নবকুমারকে বললাম, 'ভোট তো এসে গেল – এদিকে কোন পার্টি অবস্থা কেমন?'

'আমরা আর ভোট বাবুদের বিশ্বাস করি না।'

'কেন?'

'পাঁচ বছর কারখানাটা বন্ধ হয়ে আছে। আমরা যাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলাম গতবার, সে কিছু করল আমাদের জন্য? কারখানাটা খোলাতে পারল।' কথাটা বলতে বলতে নবকুমার একটা বাড়ি দেখাল হাত তুলে। ভাঙ্গা ঘর। এই ঘর ছিল গোপাল সোমের।

সেই সময় গোপাল সোমের বয়স ছিল তেইশ। এইচ পি জি ডবলুর শ্রমিক। ছোটবেলা থেকেই ডাকাবুকো। বিভিন্ন রকম বন্ধুবান্ধব ছিল। চাকরি পাওয়ার আগে সেই সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কিছু কিছু অসামাজিক কাজও করেছে। কিন্তু সেটার ঢেউ থেমে গিয়েছিল চাকরিটা পাওয়ার পর। কিছুদিন মসৃণ, সুস্থ জীবন। তারপরই লক আউট। বাড়িতে অশান্তি। এবং সেই অশান্তিতে জর্জরিত হয়েই ওর চেতনা আবার ওকে হাজির করে সেইসব পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। হাত মেলায়। এবং এই সবের প্রায় পনের-ষোল মাস পর বন্ধুদের সঙ্গে হাতে ছুরি তুলে নিয়ে অসামাজিক কাজ করতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খায়। আহত হয়। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয় না। প্রাইভেট ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করায়। কিন্তু সেই হাতুড়ী ঠোক্কা চিকিৎসা ওর অসুস্থতা আরও বাড়িয়ে দেয়। মানসিক ভাবেও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাড়ির অবস্থা দিনে দিনে চরমে ওঠে। কিন্তু অসহায় যুবকটার পক্ষে এইসব মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

জীবন-যন্ত্রণা ঘুঁন পোকার মতো ওকে কুঁরে মারছিল।

একদিন গভীর রাত। ঘুম আসছিল না। পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার। চৌকির নিচ থেকে কেরোসিনের ট্যাঙ্কটা বের করে গোপাল সোম। গায়ে ঢালে। গন্ধে ভেসে যায় চরাচর। তখন প্রয়োজন একটা দেশলাই কাঠির। দেশলাই জ্বালে, কয়েক মুহূর্ত পরেই ওর চেতনার আগুন ও শরীরের আগুন একসঙ্গে জ্বলতে থাকে। তারিখ : ২৫।১।৮২।

গোটা পাড়াটা ঘুরছিলাম। শত শত শ্রমিক শুধুমাত্র অস্তিত্বের শ্বাসটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। এবং সেইসব হাতে উঠে আসছে, ধূপকাঠির বাক্স, বিড়ির পাতা, লজেন্সের কৌটো। বৌ-ঝিদের থাবা থেকে দেওয়ালে লেপটে যাচ্ছে ঘুঁটে। বিক্রি হবে। আবার কোন কোন তরুণের পেশীবহুল হাতে উঠে আসছে ধারাল ছুরির বাঁট। প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা, 'যে কারখানা খোলাতে পারবে – তাকেই ভোট দেব।'

শ্রমিকদের এই এককাট্টা মতামতকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগাতে চাইছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার – নির্বাচনের ঠিক আগে একটা হাই-পাওয়ার কমিটির মাধ্যমে কারখানা খোলানর ব্যবস্থা করেছে। যদি খোলে দু-পক্ষ দাবী করবে – 'কারখানা আমরা খুলিয়েছি। আমাদেরই ভোট দাও।' যাই হোক – ঐ প্রসঙ্গে একটু পরেই বিস্তৃত আলোচনায় আসছি।

যে মহিলা বাসন মাজছিল, তার দিকে তাকিয়ে নবকুমার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় – 'নেপালদা আছে?'

'আছে। ভিতরে যান।' আমরা শীতের দুপুরে টিনের শেডের নিচে ঢুকলাম।

নবকুমার তার তীক্ষ্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, 'আরেকজন মৃত শ্রমিকের স্ত্রী।'

চকিতে মনে হোল, ছবিটা নিতে পারলে ভাল হত। নবকুমারকে বললাম, কিন্তু মহিলা রাজী নন। আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনাও করতে চান না।

'আসলে বৌদি বাইরের কারুর সঙ্গেই তেমন কথাবার্তা বলেন না।' বললেন নেপাল দত্ত। মৃত সুনীলরঞ্জন দত্তর ভাই। 'দাদা মারা যান ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮০। কারখানায় লক আউট হয় ঐ বছরই মে মাসে। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। বড় ফ্যামিলি। হঠাৎ লক আউট হওয়ায় প্রত্যেকেই দিশাহারা হয়ে পড়ি, কারণ – আমিও এইচ পি জি ডবলু-তে (হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস্) কাজ করতাম। দাদা এখানে ইলেকট্রিকের কাজ করতেন। মোটামুটি খারাপ বেতন পেতেন না। ফ্যাক্টরি লক আউট হওয়ার পর – বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন জায়গায় উপযুক্ত কাজের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'রৌরকেল্লায়' একটা কন্‌স্ট্রাকশান কোম্পানীতে জয়েন করেন। তখন দাদার বয়স ৪৫/৪৬। ঐ বয়সে নতুনভাবে কন্‌স্ট্রাক্‌শনের কাজ শুরু করতে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উচ্চতায় উঠে কাজ করতে একটা টেনশান তৈরি হয়। দাদার পক্ষে সেই টেনশান সহ্য করা সম্ভব হয় নি। অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান ১৯৮০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর।' একটানা বলে কথাগুলো শেষ করেন নেপাল দত্ত। ঘরের বাতাস ভারী হয়।

আরেকজন মৃত শ্রমিক যমুনা সিংয়ের ভাঙ্গা দেওয়ালের সামনে বিরাট 'হাত' চিহ্ন। পাশাপাশি 'সিটুর' পোস্টার – 'মুখ্যমন্ত্রীর বারবার আবেদন সত্ত্বেও কেন হিন্দুস্থান পিলকিংটন জাতীয়করণ করা হচ্ছে না?' কিন্তু কেউ কোন খোঁজ রাখেন না, মৃত মানুষটার পরিবার-পরিজন কে-কেমন আছে। 'সিটুর' জেনারেল সেক্রেটারী শশধরবাবু জানেনও না ক'জন শ্রমিক এ পর্যন্ত মারা গেছে। অথবা জানলেও তিনি হয়ত কোন গূঢ় কারণে আমাকে সেটা জানান নি। তবুও আমরা সেই বত্রিশজন মৃত শ্রমিকের তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং প্রকাশ করছি পরবর্তী অংশে।

আমরা শশধর বসুর কাছে গিয়েছিলাম তথ্যের জন্য। শশধরবাবু বাড়ি ছিলেন। দুটো বাক্স দেখিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে সমস্ত চিঠিপত্র আছে। কিন্তু কি হবে পুরোন দলিল ঘেঁটে? আসুন চা খান।' আমি তথ্যের বদলে পেলাম চা-বিস্কুট। বললাম, 'তাহলে আমাকে লিখে নিতে হচ্ছে আপনি কোন তথ্য দেবেন না।'

সামান্য বিব্রত হাসি হেসে শশধরবাবু বলেন, 'কি হবে? খবরের কাগজে লিখে কোন লাভ নেই!' আমি স্থির ভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে উঠে পড়লাম।

আবার যমুনা সিংয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রায় ২৫ বছর লোডিং সেকশনে কাজ করছে। ক্লোজারের পর দীর্ঘদিন সবজি বিক্রি করে, ফেরি করে সংসার চালিয়েছে। খিদে ওকে অক্টোপাসের মতো আক্রমণ করেছে, ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। আক্রান্ত হয়েছে গ্যাসট্রিক আলসারে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, প্রয়োজন হয়েছে বিদেশী ওষুধের। কিন্তু সেটা ওর কাছে স্বপ্ন মাত্র – কিন্তু যেহেতু ঘুম ছাড়া স্বপ্ন সম্ভব নয়, সেজন্য ওষুধের জন্য চিরতরেই ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে ও।

১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল কারখানার শেষ ফার্নেসটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা শুধুমাত্র চালু রাখার জন্যই দৈনিক প্রয়োজন ১৮।২০ হাজার টাকার। কোম্পানীর সে সংগতি নেই। সেই ফার্নেসের পাশে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে শ্রমিক কন্যা শরীর বিক্রি করে। তীক্ষ্ণ চোখ তুলে এদিকে ওদিকে তাকায়।

পিতার দুই বিয়ে। আমাদের আলোচ্য মেয়েটি (নাম জানান সম্ভব নয়) প্রথম স্ত্রীর। কিন্তু বাবা যেহেতু দ্বিতীয় স্ত্রীর বশীভূত, সেজন্য মেয়েটির মানসিক যন্ত্রণা আজন্ম। কারখানা যতদিন চালু ছিল – ওর ওপর সৎ মায়ের তেমন কোন দুর্ব্যবহার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। কিন্তু কারখানা বন্ধ হওয়ার পর পিতার অসহায় মুখ এবং বিমাতার ক্রোধী চোখ ওকে আদিম ব্যবসায়ে নামতে বাধ্য করে।

কয়েক মাস হতে চলল এরকম দশা ওর। আমাদের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি। ওকে সান্ত্বনা জানাই, কিন্তু সবই অর্থহীন, ব্যাঙের মতো মনে হয়। মেয়েটি জল-ঝরা চোখে শূন্যপানে তাকায়। ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে, বিয়ের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এখানে অনেকেই মেয়েটির কথা জানে, যেজন্য কোন যুবকই স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে না। বাড়িয়ে দেয় না আশ্রয়ের হাত।

আসন্ন অষ্টম লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই কারখানাটা খোলার জন্য কংগ্রেস ও সি পি এম দু-তরফের তৎপরতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। একটা হাই পাওয়ার কমিটি গঠিত হয়েছে, যাদের প্রধান হলেন শ্রী পার্থ রায়, আই এ এস। এই প্রচেষ্টার মূল কারণ দু'পক্ষই শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারের ভোটারদের ভোটগুলো পেতে চায়। এখনো চেষ্টা চলছে, হয়ত খুলবে নির্বাচনের আগেই। যাই হোক, এবারে বিশদ আলোচনার আগে

আমরা একটু অতীতচারী হতে পারি।

হিন্দুস্থান পিলকিংটনের অতীত বৃত্তান্ত

আপাত দৃষ্টিতে এটা অবিশ্বাস্য যে, একটা লাভজনক ব্যবসা – প্রায় একচেটিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথচ কেউই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসছে না হাল ধরার জন্য। রাজ্য সরকার আর কোন 'সিক' ইন্ডাস্ট্রি অধিগ্রহণ করতে চান না – কিন্তু এটা তো আদৌ 'সিক' ইন্ডাস্ট্রি নয়। তবে কেন রাজ্য সরকার এই অচল অবসহাও অধিগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসছেন না? কেন কর্তৃত্বের ভার বারবার এসে পড়ছে এক-একজন শ্রমিক বিরোধী বেনিয়ার হাতে? কেনই বা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে তাগাদা দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করতে চেয়েছেন? এসব অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন।

১৯৫২ সালে পিলকিংটন ব্রাদার্সের সঙ্গে এন আর সরকার যৌথভাবে এই ব্যবসা শুরু করেন। উৎপাদন শুরু হতে এক বছর পেরিয়ে যায়, ১৯৫৩ নাগাদ শুরু হয় শিট গ্লাসের উৎপাদন। ১৯৬২ সালে তৈরি করা হয় 'রোলড্ প্লেট ফার্নেস' এন আর সরকারের মৃত্যুর পর চেয়ারম্যান হয়ে আসেন পি এন তালুকদার। পি এন তালুকদারের শেয়ার ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। ৫৬ শতাংশ শেয়ার ছিল পিলকিংটন ব্রাদার্সের। বিদেশ থেকে অন্যান্য ব্যবসা ছেড়ে বারবার এখানে আসতে ওদের বিস্তর অসুবিধা, এজন্য তালুকদারকেই ওরা চেয়ারম্যান মনোনীত করেন, কেননা তালুকদার ছিলেন ওদের খুবই আস্থাভাজন।

কিন্তু তালুকদারের পরিচালনার মধ্যে ছিল না দূরদর্শিতা। সি আই টি ইউ-এর এক নেতা বললেন, 'তালুকদারের অযোগ্য পরিচালনায় ১৯৭২ সালে কোম্পানীর অবস্থা এমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে যে, একটা গুজব রটে যায় – যে কোন সময় কোম্পানী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এবং সেই সম্ভাবনাও দেখা দেয়। শ্রমিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ের কিছু আগে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় এসেই আই এন টি ইউ সি জোর করে ৩৫০ জন ছেলেকে কোম্পানীতে ঢোকায় এবং সি পি আই-এর ১৬০ জন শ্রমিককে কারখানা থেকে বিতাড়িত করেন। গেট দিয়ে ঢুকতেও দেয় না – অনুরোধ উপরোধ বা অন্য কোন প্রচেষ্টায়ও ফল হয় না। মৃত্যুভয় দেখান হয়। এই অবস্থায় কারখানার মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা। অফিসারদের মধ্যে রেশারেশি – একটা প্রতিষ্ঠান ডুবতে বসলে যা হয় আর কি, যে যা পারে আখের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত।'

'ঠিক ঐ সময় ইংল্যান্ডে হ্যারি পিলকিংটন রিটায়ার করেন। ইংল্যান্ডের মূল পিলকিংটন কোম্পানীর চেয়ারম্যান হয়ে এলেন মিঃ বার্ড। তিনি চেয়ারম্যান হয়েই এখানকার কারখানা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। শুরু হোল অনুরোধ-উপরোধ। শ্রমিক ইউনিয়ন, অফিসার, – সকলে মিলে ডেপুটেশান দেয়। ফলে মিঃ বার্ড সরেজমিন তদন্তের জন্য একটা টীম পাঠান। উদ্দেশ্য, খতিয়ে দেখা – কারখানা চালালে লাভের সম্ভাবনা আছে কিনা! তাঁরা তদন্ত করে রিপোর্ট দেন, এখনো এটাকে ঠিকমতো চালাতে পারলে পূর্বের লাভজনক অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব।

১৯৭৬ সালে তালুকদার রিটায়ার করেন। আসেন সি ডি থাপার। ১৯৮০ পর্যন্ত কারখা চলে ভালভাবে, কিন্তু ১৯৮০ সালের ২৫শে মে শ্রমিক-অসন্তোষ – এই অজুহাতে থাপার লক আউট ঘোষণা করেন। কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে শ্রমিকদের কথাবার্তা চলতে থাকে। কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসেন মিঃ এইচ এল সোমানী টেবিলে বসে কফি, স্ন্যাকস্ আর ডানহিল সিগারেট খেতে। কাজের কাজ কিছুই করতে পারেন না।

এই সময় বেশ কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানী এই কারখানার স্বত্ব গ্রহণ করতে উৎসাহ দেখায়। তাদের মধ্যে দক্ষিণের শিল্পপতি সি এ তক্তাওয়ালা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করে এই কারখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৮২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর লক আউট তুলে নেন।'

৩২ জন মৃত শ্রমিকের নাম ও অন্যান্য বৃত্তান্ত

নাম	টিকেট নম্বর	মৃত্যুর তারিখ
১। সুনীল রঞ্জন দত্ত	৬০১/২১৩২	১-৯-৮০
২। নর বাহাদুর থাপা	৬৬২/৭৮৯	২-৮-৮১
৩। সঞ্জয় কুমার সাহা	৫১০/১৫৭	২৯-৩-৮২
৪। যমুনা সিং	৫৪০/৩৯৫	১৫-১২-৮০
৫। সুনীল কুমার দাস	৫১০/১৭১	১৪-৬-৮১
৬। অনিল চন্দ্র দে	৬০১/৬৬০	১২-১২-৮০
৭। গোপাল সোম	৫৪০/৪৩৬	২৫-১-৮২
৮। মহাদেব সিং	৫৩০/২০৩২	১৯-৬-৮২
৯। মহু আমিরুদ্দিন	৬০৩/২১৪৪	২১-৭-৮১
১০। জন করনেলিয়াম	৬০৩/২১৪৯	২৮-১০-৮১
১১। মঙ্গরু ভগত	৫৪০/৪০৫	১০-৮-৮২
১২। চন্দ্র বাহাদুর ছাতুই	৬৬২/৮৫২	২৫-১১-৮১
১৩। নগেন চক্রবর্তী	৫৬০/৪৯৬	
১৪। বি.মাঝি	৫০৩/২৭	২-৭-৮২
১৫। ফাগু টুডু	৫০৩/৪০	১৪-১১-৮১
১৬। এ.এস.মহাপাত্র	৫৪০/৪৪৯	১৪-১-৮২
১৭। কে.মাঝি	৫১০/৩	৬-৮-৮২
১৮। ইউ.পাণ্ডে	৬৮০/৬৫৪	১৪-৩-৮২
১৯। জি.রাম	৬১৩/৭৬৯	২৯-৯-৮২
২০। এইচ.কে.ভট্টাচার্য	৫৪০/২০৭৭	২৭-২-৮২
২১। বি.মাঝি	৫১০/৯৮০	১৭-১২-৮০
২২। বি.হরি	৬৬৫/৮৮০	২০-১১-৮২
২৩। পি.হাজরা	৫৪০/২০৫১	২০-১০-৮২
২৪। এস.যাদব	৫৪০/৩৯২	২৩-২-৮৩
২৫। দুখু মাঝি	৫৬০/৫৩৬	২৩-৩-৮৩
২৬। ফণি চক্রবর্তী	৫৪০/২০৮০	৮-৬-৮৩
২৭। জি.দাস	৫৪০/৩৪০	২৩-৭-৮৩
২৮। প্রহ্লাদ মল্লিক	৬০৩/২১৪৭	৭-৯-৮৩
২৯। এম.শীল	৫৪০/৪৬৭	১০-২-৮৪

কিন্তু এখনো কেন ঘোষিত লক আউট না থাকা সত্ত্বেও অঘোষিত লক আউট? কেন তারা কারখানার গেট খোলা রেখে সরে পড়েছেন চুপি চুপি? কর্মচারীরা যাচ্ছেন-আসছেন, কিছু কিছু কাজও করছেন। কিন্তু কোন বেতন পাচ্ছেন না।

গত বাইশে নভেম্বর নিম্নোক্ত নোটিশ সার্ভ করা হয় শ্রমিকদের মধ্যে:

22nd November 1984
Hidusthan Pilkington Glass Works Ltd.
Asansol
Notice

The employees are hereby informed that whatever meagre resources presently available with us a advance against order will be disbursed, after meeting esential expenses, at the rate of Rs. 30/– (Rupees thirty), per head to all employees against salaries/wages for the month of April/May '84 on Saturday 24th November at 4 P.M. after despatch of 4 trucks.

The management solicits Co-operation from all concerned in this respect.

The above payment will be made from the general office wages section counter against payment slips available from respective departments.

It may be noted that, it will not be possible to make any payment in case of shortfall in despatch as per above schedule.

(sd/-)
L. B. LAHA
Officer-in-charge.

উপরোক্ত নোটিশ নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণ করে, শ্রমিকরা কাজ করছেন, কিন্তু ঠিক মতো বেতন পাচ্ছেন না। কোম্পানি সেক্রেটারী মিঃ এ বি মুখার্জী বললেন, 'মিঃ তক্তাওয়ালা ক্ষমতায় আসার পর চালু করলেন 'রোলড্ প্লেট ট্যাঙ্ক', যার উৎপাদন ক্ষমতা মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ মাত্র। বাকী ৭০ শতাংশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন 'শিট ট্যাঙ্ক' চালু করার। কিন্তু তার জন্য দরকার প্রায় এক কোটি টাকা। এই টাকা কে দেবে? তাছাড়া কোম্পানীর আরও অনেক দেনা —'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশান করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া' রাজী হয় দু কোটি টাকা লোন দিতে। লোন মঞ্জুর হয় ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষেরদিকে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে।'

'শ্রী বল্লভ গ্লাস ওয়ার্কস্ লিমিটেড' ছিল তক্তাওয়ালা ও তাঁর ভায়েদের পরিচালনাধীন। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ ঐ কোম্পানির পরিচালনা বিষয়ে ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাঁধে এবং তক্তাওয়ালা অ্যারেস্ট হন। ফলত: আই আর সি আই-এর প্রতিশ্রুত দু কোটি টাকা লোন আর মিলল না।

তারপর থেকে চেষ্টা চলে আসছে আগের প্রোডাকশান বিক্রি করে কোম্পানি চালানোর। কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার। কিন্তু সেটা অসম্ভব প্রচেষ্টা, '৮৪ সালের ২০ এপ্রিল থেকে সমস্ত ফার্নেস বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেননা এক-একটি ফার্নেস শুধু চালু রাখার জনাই প্রতিদিন প্রয়োজন ১৮।১৯ হাজার টাকার।

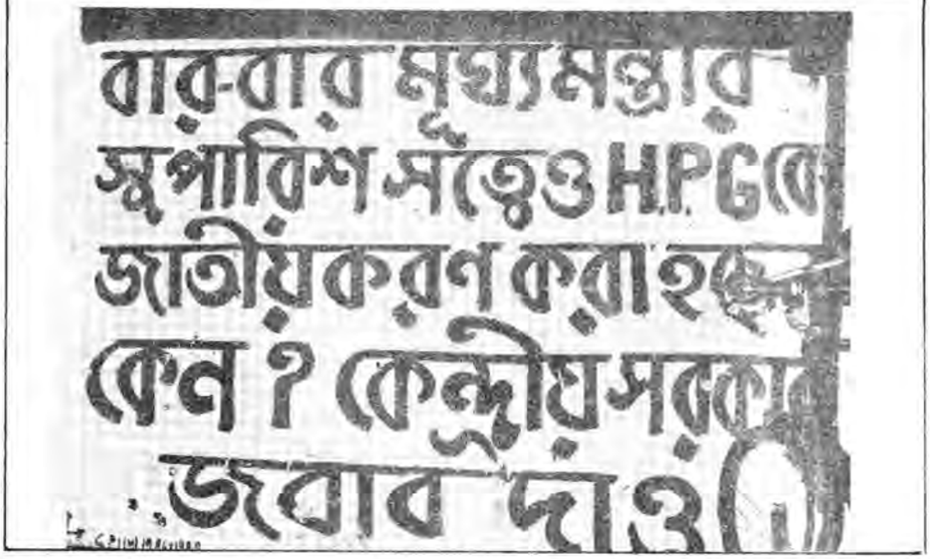

পরপর আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। সেণ্ট্রাল এক্সাইজ ওদের দাবী মতো ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে কোর্টের অর্ডার নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটনের ২২ লাখ টাকার মাল আটক করেছে।

কোম্পানির বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি পাওনাদার কোম্পানি কোর্টে পিটিশান দাখিল করেছে।
১। বি পি বাজোরিয়া,
২। ডারুকা রোড লাইনস্,
৩। শিবমণি এণ্ড কোম্পানী,
৪। বেলতলা টিম্বার ওয়ার্কস্,
৫। পেপার হাউস। এই পাঁচটি কোম্পানির মিলিত দাবীর পরিমাণ প্রায় ১২ লাখ টাকার মতো। এছাড়া গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কোম্পানির কাছে পাবে কম-বেশী আট কোটি টাকা।

কারখানা খোলার প্রচেষ্টা

১৯৮৪ সালের ৬ এপ্রিল জ্যোতি বসু 'ইউনিয়ন ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টারকে' চিঠি লেখেন। অনুরোধ করেন রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য। তাঁর অনুরোধের ভিত্তিতে ইউ আই এম পাঁচ জনের একটি হাই-পাওয়ার কমিটি গঠন করেন এবং সরেজমিন তদন্তে পাঠান। কমিটিতে ছিলেন ১। মিঃ পার্থ রায়। আই এ এস। সেক্রেটারী টু দি চীফ মিনিস্টার। ২। মিঃ এ পি সরোয়ান। আই এ এস। জয়েণ্ট সেক্রেটারী টু ইউনিয়ন ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার। ৩। মিঃ এম কে মণ্ডল। টেকনিক্যাল অ্যাডভাই-সর অফ আই আর সিআই। ৪। গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি। ৫। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার প্রতিনিধি। পাঁচজনের এই টীমকে নেতৃত্ব দেন পার্থ রায়।

জুলাই-এর প্রথম দিকে পাঁচটি কোম্পানি হিন্দুসহান পিলকিংটন সম্পর্কে উৎসাহ দেখায়।

১। ত্রিবেণী শিট গ্লাস।
২। হরিয়ানা শিট গ্লাস।
৩। ইন্দো-আসাহি গ্লাস ওয়ার্কস্।
৪। উইণ্ডো গ্লাস।
৫। শ্রী গোপাল গ্লাস।

পার্থবাবুর নেতৃত্বে এই হাই পাওয়ার কমিটি চার সপ্তাহ সময় নেন। মিটিং হয়েছে ২৯ আগস্ট। ৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে কোম্পানি সেক্রেটারী মিঃ এ বি মুখার্জী জানালেন, '২৮ সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং থেকে মিস্টার পার্থ রায় বলেছেন —মিস্টার খেরুকার মালিকানা-ধীন 'উইণ্ডো গ্লাস কোম্পানি' মনোনীত হয়েছে হিন্দুস্হান পিলকিংটন পরিচালনার জন্য।'

কিন্তু অন্যান্য সূত্র থেকে আমাদের কাছে খবর আছে মিঃ খেরুকা মাত্র ৬০০ শ্রমিক নিয়ে কাজ শুরু করতে চান। এটা তাঁর আরও বেশ কয়েকটি দাবীর একটা। যদি সরকার এটামেনে নেন, তাহলে পার্থ রায় বা পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে পড়বে — কেন এই শ্রমিক বিরোধী প্রস্তাব মেনে নেওয়া হচ্ছে? কেন এই অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ না করে একজন শ্রমিক বিরোধী মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে?

নির্বাচনের ঠিক আগে এটা ভাবার দরকার আছে। এবং এটাও ভাবার আছে, নির্বাচনের ঠিক আগেই কারখানা চালু করার এই সক্রিয় প্রচেষ্টা—এর প্রকৃত কারণ কি? সেটা জেনে নিয়েই ভোটারদের যেতে হবে বুথে। তুলে নিতে হবে টুকরো কাগজ ও স্ট্যাম্প। তবুও আমরা চাই শ্রমিকদের স্বার্থ মেনে নিয়ে কারখানা খুলুক। কেননা এক একটি গোপাল সোমের মৃত্যু যদি রক্তবীজের মতো তৈরি করে হাজারটি গোপাল সোম, তখন আমাদের দাদারা দাঁড়ানোর জন্য পায়ের নিচে এক টুকরো জমিও পাবেন কি? □

রাজীব গান্ধী সফদরজং ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কি?

দিল্লি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি:

সিকিউরিটি বিভাগ এবং ইনটেলিজেন্স বিভাগ থেকে নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধীকে ১, সফদরজং রোডের বাড়িটি ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানান হয়েছে। এর সব থেকে বড় কারণ হল, সফদরজং রোডের প্রধানমন্ত্রীর এই বাড়িটি বড় রাস্তার এত কাছে যে এর নিরাপত্তা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ আর নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। শ্রীমতী গান্ধীর উপর যে আক্রমণ প্রায় এক মাস আগেই ঘটে গেছে, তারপর এমন ধারণা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মনে আসাটা অবশ্যই অস্বাভাবিক নয়। অথচ এই বাড়িটি বড় রাস্তার অত্যন্ত কাছে হওয়ায় এটাকে যথাযথ ভাবে সুরক্ষিত করার কিছু বাস্তব অসুবিধেও দেখা দিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীকেও একসময় ইন্টেলিজেন্স বিভাগ থেকে বাড়ি পরিবর্তনের অনুরোধ জানান হয়েছিল। সে সময় শ্রীমতীগান্ধী ইন্টেলিজেন্স বিভাগের যুক্তিগুলোকে যথেষ্ট জোরাল মনে করেন নি। বিশেষত: অপরাশেন ব্লুস্টারের পর তাঁর দেহ রক্ষী এবং গৃহরক্ষীদের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের যে সব ব্যক্তি ছিলেন তাদের অপসারণের কথা শ্রীমতী গান্ধীকে বলা হয়েছিল। তবে তিনি এটাও অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। পাঞ্জাব সমস্যার শুরু থেকেই, ১ সফদরজং রোড়ে সে কোন গাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু শুধু এতটুকু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। এছাড়া তাঁদের ধারণা এই বাড়িটিকে আকাশ পথে আক্রমন করা বেশ সহজেই সম্ভব। রাজীব গান্ধীকে অনুরোধ জানান হয়েছে, এই বাড়িটি পরিত্যাগ করে, তিনমূর্তি ভবন বা হায়দ্রাবাদ ভবন, এর কোন একটিকে বেছে নিতে। তবে সেক্ষেত্রেও কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে। তিনমূর্তি ভবনে একদা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল টানা ১৭ বছর কাটিয়েছিলেন। এই বাড়িটি বিশাল এলাকা জুড়ে এবং বড় রাস্তা থেকে যথেষ্ট ভেতর দিকে। কিন্তু বহুদিন আগেই এই বাড়িটিকে জাতীয় ভবন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই বিচারে এটা সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় জনতার সম্পত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে এরকম কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে, এমনকি তিনি যদি প্রধানমন্ত্রীও হন, কোন রকম ব্যক্তিগত ব্যবহার অত্যন্ত বেমামান। যদিও শোনা যাচ্ছে রাজীব গান্ধী সম্ভবত হায়দ্রাবাদ ভবনকেই আপাতত তাঁর বাসস্থান হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু হায়দ্রাবাদ ভবনটি বড় রাস্তার বেশ কাছাকাছি অবস্থিত এবং এই ভবনটির তিনটি দিকেই বড় রাস্তা। ফলে ১ সফদরজং রোডের বাড়িটির চেয়ে এই বাড়িটিকে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। অবশ্যই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং স্বয়ং নতুন প্রধানমন্ত্রী। একটা সময় ছিল যখন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত এত গভীর চিন্তাকে অনেকেই সময় ও অর্থের অপচয় মনে করতেন। শ্রীমতী গান্ধীকে অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কোন দিন বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ব্যবহার করতেন না। করতেন না শুধু নয়, তিনি এধরনের কোন জ্যাকেট সঙ্গে রাখতে পর্যন্ত আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর এ বিষয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। তবে যে ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, তা হল যে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো শ্রীমতী গান্ধীর প্রাণ রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের হাতেই পুনরায় রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর সময় নিরাপত্তার জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা হত দিল্লি পুলিশ, দিল্লী আর্মড পুলিশ এবং ইন্দো টিবেটিয়ন বর্ডার পুলিশের কমান্ডোদের। বর্তমানেও সম্ভবত তাই করা হবে। তবে অবশ্যই এটাও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্তব্য, যে ডিউটির পরে অর্থাৎ অন্য সময় গুলোতে এইসব নিরাপত্তা কর্মীরা কি ভাবে সময় কাটান সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর রাখা। এবিষয়টিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার জন্যই শ্রীমতী গান্ধীকে জীবন দিতে হল। শ্রীমতী গান্ধীর বাড়ির ক্যাম্পাসে থাকতেন বিয়ন্ত সিং। হত্যা কান্ড ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে পেয়েছে আপত্তিকর চিঠি, পোস্টার, বিদেশীমুদ্রা এবং আগ্নেয় অস্ত্র। এটা কি ভাবে সম্ভব হয়েছিল। এবং একই সঙ্গে সতবন্ত সিং-এর কার্যকলাপ সম্পর্কেও কোনরকম খবর রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে এই গোয়েন্দাবিভাগ। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই গোয়েন্দা বিভাগের অকর্মণ্যতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে?

অথচ এই কর্তব্য অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অদ্ভুত ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন। দিল্লী পুলিশের কিছু অফিসারকে সাসপেন্ড করা হলেও, দিল্লি আর্মড পুলিশ এবং ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? বিয়ন্ত সিং যেমন এসেছিলেন দিল্লী পুলিশ থেকে, সতবন্ত সিং তেমনি এসেছিলেন দিল্লি আর্মড পুলিশ থেকে।

অর্থাৎ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের উচ্চতম কর্তাব্যক্তিদের প্রতি কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট নরম মনোভাবই দেখিয়েছেন। এর বিনিময়ে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা কি ফিরিয়ে দেবেন? পুনরায় কর্তব্যে অবহেলা? পুনরায় জাতীয় সংকট? না কি এক নি:ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। □

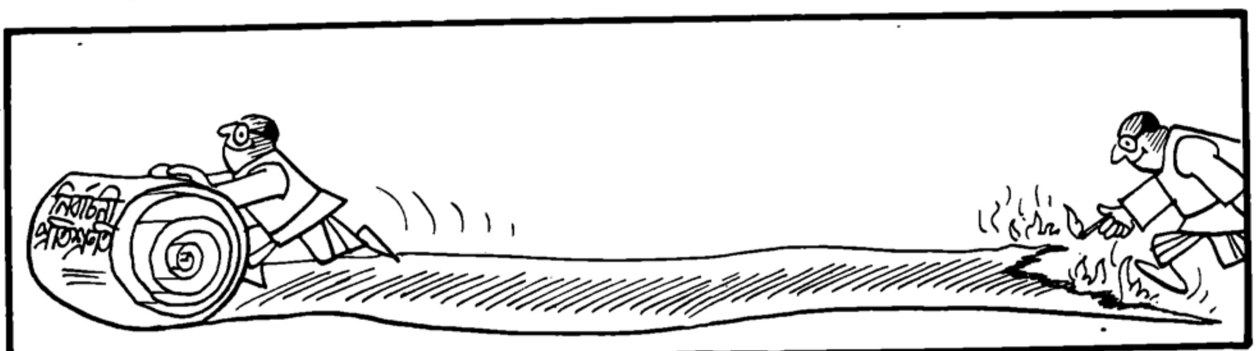

'পদাতিকে'র সুভাষ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছেন কংগ্রেসকে

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবারের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছেন, এরকম একটা খবর প্রথমে শুনি। এতে বিস্ময়বোধ করার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু বাঙালীর এই প্রিয় কবি সরাসরি কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন শুনে কৌতূহল হল। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাড়িতে ছুটে গেলাম। আ বা পত্রিকার এক সাংবাদিক এই আপাত ওলোট-পালোট পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-ব্যঞ্জনা জানতে সুভাষবাবুকে কব্জা করার চেষ্টা করছেন তখন। ঐ তরুণ সাংবাদিক নিজের চাপা ক্ষোভ, খুব যে একটা আয়ত্তে রাখতে পারছিলেন এমন নয়। সুভাষ চেষ্টা করছিলেন নিজের রাজনৈতিক স্ট্যান্ড স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে।

রাজনীতির সামান্য খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন সি পি আই প্রথম দু-টুকরো হওয়ার পর কংগ্রেসকে সমর্থন করা সি পি আই-র দিক থেকে এমার্জেন্সী পর্যন্ত অটুট ছিল। সি পি আই আবার ভেঙে যখন এ আই সি পি এবং সি পি আই হল, সেই সময় থেকে, অর্থাৎ অতি সাম্প্রতিককালে সি পি আই কংগ্রেস সমর্থনের নীতি বদলায়। এ আই সি পি থেকে যায় আগেকার তাত্ত্বিক অবস্থানেই। সম্প্রতি সংবাদপত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের বিবৃতির পর, 'পরিচয়' সম্পাদক দেবেশ রায় ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। যদিও তিনি এমর্জেন্সীর বিরোধীতা করেন নি। এইটুকু হল পটভূমি। পাঠক, এরপর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলা যাক

□ আচ্ছা সুভাষদা, আপনার এই স্ট্যান্ডের সঙ্গে এ আই সি পি'র স্ট্যান্ডের তো মিল রয়েছে...

□ থাকতে পারে, কিন্তু আমি এখন কোন দলে নেই, এটা আমার দিক থেকে ব্যক্তিগত চিন্তা। মার্কসবাদী হিসাবেই আমি এটা ঠিক মনে করছি।

□ সেটা কি এজন্য যে কংগ্রেসও সমাজবাদের কথা বলে?

□ দেখো, একমাত্র কমিউনিস্টরাই সমাজতন্ত্র আনবে একথাটা ঠিক নয়। এর বাইরের শক্তিও তাতে অংশ নিতে পারবে, এ জিনিসটা দেখা গেছে কিউবা, ইথিওয়িা, আফগানিস্থান, অ্যাঙ্গোলা...

□ এইসব দেশে রুশ মদত ছিল।

□ এক্ষেত্রে রাশিয়ার বিদেশনীতি প্রশংসাই তো বটেই। ঐ দেশগুলোর বুর্জোয়াদের শুধু আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না...

□ কিন্তু সুভাষদা, রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যনীতিকে একালের অনেক গবেষক পুঁজিবাদী দেশের নীতির মতো বলে মনে করছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা প্রচুর তথ্যও উপস্থিত করছেন।

□ একটা কথা রাখব, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কোন তথ্য দিতে পারব না। তবে এটা ফেইথের ব্যাপার, আমি বিশ্বাস করি না।

□ তাহলে আপনি এবার কংগ্রেসকে ভোট দিচ্ছেন

□ হ্যাঁ, দিচ্ছি। গীতা অবশ্য আগের বারেই দিয়েছে। শ্লোগান, চীৎকার আর দেওয়ালগুলো সংখ্যা আর ভরিয়ে ফেললেই ভোট পাওয়া যায় না। এ ধরণের সমস্ত প্রচার বাইরের ব্যাপার। মানুষ বিচার করে। অতীতেও এ জিনিস দেখেছি। গোপালদা বলেছেন তবু বামফ্রন্টকে ভোট দেবেন, অর্থাৎ ওটা ওনার ফেইথ। আমার অবস্থা ধরো চাঁদ সওদাগরের মতো ডান হতে না পারলে বাঁ হাতেই ভোটের কাগজে ছাপ দেবো। আসলে কি জানো, যখন জওহরলালকে মার্কিনের দালাল বলে কবিতা লিখেছি, তখন সেটাও লিখেছি বিশ্বাস থেকে। আর আজ যা করতে চাইছি তার পিছনেও রয়েছে বিশ্বাস।

□ আপনি, গোপাল হালদার এবং শেষে দেবেশ রায়ের বক্তব্য পড়ে কেমন একটা মনে হতে পারে এদিকের দুর্গরক্ষায় উনিই শেষ বীর।

□ আমি মনে করি দেবেশের স্ট্যান্ড সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী স্ট্যান্ড। প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে চাইছে। আর দেখে যাওয়া-টা কোন কমিউনিস্টের স্ট্যানড হতে পারে না, যাকগে ওর কথা...

□ জাতীয় সংহতি এবং উন্নয়ন, কংগ্রেসের এই নীতির জন্যই তারা আপনার সমর্থন পাচ্ছে, তাই তো।

□ একেবারে ঠিক।

□ এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক শিখ-নিধন যজ্ঞকে আপনি কিভাবে দেখবেন?

□ রাখব, শোন ঐসব নিধন যজ্ঞ-টজ্ঞ ঠিক কথা নয়। দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে ঠিকই। কংগ্রেসে কিছু রাউডি পিপল আছে, তাছাড়া একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ঘটতেই পারে।

একটা ঘটনার কথা বলি অতীতে পরিচয় পত্রিকার অফিসে দিলীপ নামে এক কমরেডের কথা বলি। একদিন হঠাৎ দেখি তার হাতে ব্যান্ডেজ। খোঁজ নিতে জানা গেল সে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিল, বোমা বাঁধতে গিয়ে বার্স্ট করে। আসলে এর পিছনে ছিল দিলীপের ব্যক্তিগত ইতিহাস...

□ তবু কমিউনিস্ট পার্টিতে এটা কোন সাধারণ লক্ষণ নয়, অন্যদিকে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে

□ আরে কংগ্রেস কোন দলই নয়, ইন্দিরার সাক্ষাৎকার পড়ো, দেখবে বলছেন কত ভালো প্রস্তাব নিয়েছি কিন্তু অযৌক্তিক বিরোধীতায় কার্যকরী করতে পারিনি।

□ এবার জাতীয় সংহতি। সাধারণ নাগরিক প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবেই থাকতে চায়, তবু দেখা যাচ্ছে...

□ ভাঙনের ভাব...

□ হ্যাঁ, আমার মনে হয় এর পিছনে অসম অর্থনৈতিক বিকাশ...

□ ঠিকই।

□ তো, জাতীয় সংহতির প্রশ্ন একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাবী করছে বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে।

□ **আমার তা মনে হয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশ গড়ার অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে ঘিরেই গোটা দেশের মানুষের মধ্যে একটা চালাচালি হয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের ছেলে কাজ করতে অন্ধ্রে যাচ্ছে, পাঞ্জাবের সন্তান যাচ্ছে বিহার বা ইউ.পি. তে। একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চলেছে সংহতির। আসলে প্রতিবন্ধক হল আমাদের আর্থিক সমস্যা কাজের অভাব।**

আলোচনা আরো গড়াত, কিন্তু সুভাষদাকে যেতে হবে লেক গার্ডেনস পথ সভায় বক্তৃতা করতে, সেখানে তাঁর বক্তব্য কি হবে। 'আমি বক্তৃতা করতে পারিনা, আমি বলব আমি কাকে ভোট দেবো এবং কেন দেবো।' বলাবাহুল্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভোটটি এই প্রথম যাবে কংগ্রেসের পক্ষে। এককথায় এর যুক্তি দেশকে এক ও অখণ্ড রাখবে যে দল, যে দল দেশকে গড়ে তুলতে পারবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকেই ভোট দেবেন। এবং তাঁর বিচারে একাজের যোগ্যতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। □

সাক্ষাৎকার □

রাঘব বন্দোপাধ্যায়

প্রার্থী হলেই

ভি ভি আই পি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারলেই ভি-ভি-আই-পি!

সংগীসহ বাংলাদেশ বিমানে দেশের যত্রতত্র বিনা ভাড়ায় ঘুরঘুর করা যাবে। ট্রেনে, সরকারি স্টিমার অথবা লঞ্চেও সুপার ফারস্ট ক্লাসে বিনাভাড়ায় যাওয়া-আসা করা যাবে

প্রার্থী হলেই সিকিউরিটি পাবেন। পাবেন সোফারসহ সরকারি দুটি গাড়িও। বাংলাদেশে গাড়ি মানেই বিদেশী টয়টো অথবা ভোকসওয়াগন অথবা এ ধরনের কিছু।

আরও আছে। সার্কিট হাউস অথবা ইনসপেকসন বাংলোয় ফ্রি অ্যাকোমোডেশন। রেডিও এবং টি-ভিতে বলার সুযোগ ইত্যাদি, প্রভৃতি। □

□ নিজস্ব প্রতিনিধি

আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী? আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে?

* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, [illegible] অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১

ফোন নং—৪১-০০৬৯

সংবাদ বিসংবাদ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে স্টেট হেলথ (ট্রান্সপোর্ট) অর্গানাইজেশন একটা বিরাট ব্যাপার। মাথার উপরে আছেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। মিন্‌টো পার্কের বাসিন্দা ক্যাপটেন এস. কে. হাজরা যাঁর দাপটের তুলনা নেই। ডেপুটি ডিরেক্টর কে. কে. রায়কে সাস্‌পেন্‌ড করা হয়েছিল নিশ্চয়ই ভুয়ো অভিযোগে। নইলে হাইকোর্টে তাঁর পুর্নবহালের হুকুম দেবে কেন? এখন রায় ডেপুটি ডিরেক্টর নামেই। তাঁকে রাইটার্সে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কোনও কাজ নেই। জগন্নাথ।

সম্প্রতি হাজরার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ঐ সময়ে দেখা গেল বর্ধমান লেপ্‌রোসি কনট্রোল ইউনিটের একটি জীপ (ডবলু এম সি ৫৫৪৯) বর্ধমানের সিতাভোগ আর মিহিদানা নিয়ে ছুটছে ফোর্ট উইলিয়াম গেস্ট হাউসের দিকে। ড্রাইভারের নাম অলোকবাবু। গাড়িটিতে যিনি বসে ছিলেন তাঁর চেহারার সঙ্গে কলকাতার স্টেট হেলথ (ট্রান্সপোর্ট) –এর চিফ স্টোর কিপার মিত্র মহাশয় হুবহু মিলে যান। অলোকবাবু যখন ফিরে যান, তখন গাড়িতে কেউ ছিলেন না।

মিন্‌টো পার্কে হাজরা বাড়িতে সাত দিন একটি গাড়িকে (ডবলু এম এফ ৪৪৩৯) ঠায় বসে থাকতে দেখা গেল। লগ বুকে দেখলে মনে হবে দুটো গাড়ি (ডবলু এম বি ৭৯২১) এবং (ডবলু এম এফ ৪৪৩৯) একজনের জন্যই উৎসর্গীকৃত। এদিকে শ্রীরামপুরের ওয়াল্‌স হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্ক, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতির একুশটি অ্যাম্বুলেন্স আজ বছর চারেক হল আচার্য জগদীশ বসু রোডে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নারসিং কলেজের একটি স্টেশন ওয়াগন (ডবলু এম বি ৩৪৪৯) লোপাটের চেষ্টা এখনও সফল হয়নি।

মন্ত্রী হোম ট্রান্সপোর্টের গাড়িতে চলেন। মন্ত্রীর গাড়ি (ডবলু এম বি ৭৯২১) হাজরার হেপাজতে। গাড়ির মতো মানুষ নিয়েও নৈরাজ্য। ড্রাইভার নরেশ চক্রবর্তী ১ মার্চ জয়েনিং রিপোর্ট দেন। তাঁকে এখনও বসিয়ে রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ির ক্লার্ক–কাম–স্টোর কিপার প্রশান্ত গায়েন জুন থেকে বেতন পাচ্ছেন না। এপ্রিল থেকে বিনাবেতনে আছেন ডেপুটি ডিরেক্টর কে. কে. রায়। রায়ের বেতনই এখন অবধি নির্ধারিত হয়নি। যা পাচ্ছিলেন ফি মাসে তার থেকে এগারশ' টাকা বেশি পাওয়ার কথা। এ বিষয়ে ফোরম্যান রথীন ভট্টাচার্য হার্টের রোগী। দুলাল রায় চৌধুরী এবং মনি ছেত্রী ওঁকে দেখতেন। তাঁদের উপদেশ না মেনে রথীনবাবুকে বদলি করা হয় পুরুলিয়ায়, সেই ১৯৭৯ সালে। দীর্ঘদিন ছুটিতে ছিলেন। ২৫ জুন ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। কিন্তু জয়েন করার অনুমতি পান ২৭ সেপ্টেম্বর।

কলকাতার সকল সরকারি হাসপাতা–লের দেখভাল করার দায়িত্ব পূর্তদপ্তরের। ব্যতিক্রম শুধু চিত্তরঞ্জন সেবা সদন। সেখানে পি. ডবলু. ডি. আর পি. এইচ. ই. বা পাবলিক হেলথ ইনজিনিয়ারিং শাখার বিবাদ এমন চরমে পৌঁছেচে যে, হাসপাতালটি যেকোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আগে দায়িত্ব ছিল পি. এইচ. ই–র উপর। ১৯৮২–র শুরুতে এক সময়ে ননী ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়ে পড়লে পূর্তমন্ত্রীকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। সেই সময়ে যতীনবাবু জানতে পারেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে তাঁর দপ্তরের কর্মীদের কোন কাজ নেই। তখনই যতীনবাবু জানিয়ে দেন, পি. এইচ. ই–কে সরিয়ে পি. ডবলু. ডিকে হাসপাতালের কাজ দিতে হবে। স্থির হয় যে, ১৯৮৪'র সেপ্টেম্বরে পি. এইচ. ই. উঠে যাবে, পি. ডবলু. ডি. তার জায়গায় দায়িত্ব নেবে। এখন অবধি এই কাজটি হয়নি। রামনারায়ণ গোস্বামী আর যতীন চক্রবর্তীর লড়াই চলছে ফাইলে আর টেলিফোনে। এদিকে নর্দমা সাফাই বন্ধ, ট্রান্সফর্মার মেরামত হচ্ছে না।

পূর্তশাখা কাজে হাত দেবার আগেই নতুন করে ইলেকট্রিক অয়্যারিং এর জন্য ৮.৮ লাখ টাকা দাবি করেছেন। শুধু তাই নয়, পাবলিক হেলথ ইনজিনিয়ারিং এর যে ৪৩ জন এখন কাজ করছেন। সোজাসুজি তাঁদের সরিয়ে পূর্তশাখা নিজেদের লোক নিয়োগ করতে চান। পি. এইচ. ই. পড়েছেন ফ্যাসাদে। তাহলে অত লোককে বসিয়ে খাওয়াতে হবে যে! এ নিয়ে দু'-পক্ষের বিবাদ চলছে তো চলছেই। এদিকে সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েই আছে। হাসপাতালের বাড়িঘর প্রভৃতি দেখাশোনা করবে পূর্ত শাখা। সিদ্ধান্ত করা যত সহজ, সেই মত কাজ করা ততটাই কঠিন। নইলে সেবা সদনের এই হাল হতো না।

সেবা সদনের আউটডোরে যেদিন হঠাৎই দশ হাজার টাকার তারিখ–পেরিয়ে–যাওয়া ওষুধ পাওয়া গেল, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল বিসমিল্লায় গলদ আছে। এখন জানা গেছে স্টক ভেরিফিকেশন হয় না বললেই চলে। ক্যাশ–এ খুব বেশি হলে পাঁচ–সাত শ' টাকা থাকতে পারে। ১৯৮৪'র জানুয়ারিতে দেখা গেল নগদ ৯০ হাজার টাকা পড়ে আছে। নিত্য ক্যাশ বুক ভেরিফিকেশন যে হয় না, তা এথেকেই বোঝা যাবে। একজন অ্যাকাউন্টস অফিসার [illegible]।

দশ বছরে এই হাসপাতালে কিছু কনডেম্‌ন্‌ড হয়নি। নিলামে কিছু বিক্রিও হয় না। শুধু স্যালাইন বোতল বিক্রি করেই দশ বছরে দশ লাখ টাকা আসতে পারতো। এই খাতে সর্বসাকুল্যে পাওয়া গেছে মাত্র দু'হাজার টাকা। একটা [illegible] ফান্‌ড আছে নাকি। কোন্ ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হয়, তা থেকে সুদ পাওয়া যায় কি না, কিভাবে সেটাকা খরচ হয়, কেউ বলতে পারে না। কনডেম্‌ন্‌ড মাল বিক্রির টাকা থেকে এই তহবিল পূর্ণ হবার কথা।

পাঁচ বছর আগে পি. বি. এক্স. বোর্ডের জন্য কলকাতা টেলিফোনে [illegible] হাজার টাকা জমা পড়েছিল। টেলিফোনের ঘর তখনই তৈরি হয়। আটটা লাইন মাত্র। ৫০ টা সাবলাইন হতে পারে। খরচ অনেক বাঁচবে তাহলে। কিন্তু টাকা জমা পড়ার পর টেলিফোন অফিসে কেউ [illegible]।

খবরের কাগজে দুনিয়ার রদ বদলের খবর কখনও খবর হয় না কেন? এই যে টাইমস অব ইন্ডিয়ার [illegible] ব্যানার্জি আনন্দবাজারে যেতেই [illegible] জায়গাটা দখল করে নিলেন 'ইন্ডিয়া টুডে'র সুমন্ত সেন, সেটা কি খবর নয়? কিংবা 'যুগান্তরে'র বিশেষ সংবাদদাতা [illegible] ঘোষ গেলেন 'বর্তমানে' সেও খবর নয়? 'বর্তমানে' পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদের গন্ডাখানেক সাংবাদিক যোগ দিয়েছেন। 'বর্তমানের' পর বেরুবে ভারতকথা। তার জন্যও অনেকে তৈরি হচ্ছেন। □

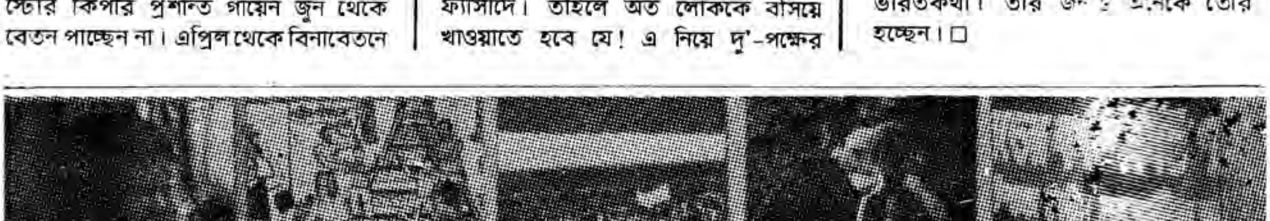

বিবাহযোগ্য পাত্র–পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি–১ ফোনঃ ২৩–৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র–পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১ তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র–পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবন্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্হির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্হির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্হির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রেExclusive Service এর ব্যবস্হা করা হয়

**পাত্র–পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer,Service এর ব্যবস্হা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার ....। যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

–আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since-June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

SANIBARER CHITHI □ Vol. 1, No. 9 □ DECEMBER 22 □ Regn. No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram : CENTPILES, Telex : CENT IN CA-021-2331
Phones : 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84